দিতেন এবং সবাইকে বলতেন যে, তার সন্তানবর্গের মাঝে শেষনবী (সা)-এর জন্ম হবে। তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা সবার জন্য অপরিহার্য হবে। যে লোক তাঁর উপর ঈমান আনবে না, তার কোন আমলই কবুল হবে না। মহানবী (সা) সম্পর্কে তার আরবী কবিতা জাহিলিয়াত আমলের কবিদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই কোসাই ইবনে কিলাব সমস্ত হাজীর জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি এ দায়িত্বটি মহানবী (সা)-এর বংশে তাঁর আমলেও বলবৎ ছিল। এই ইতিহাসের দ্বারা এ কথাও বলা যেতে পারে যে, কোরাইশদের পরিবর্তেনর মর্ম হল দীনে ইবরাহীমী পরিহার করে মূর্তি উপাসনা আরম্ভ করা।

যাহোক, আয়াতের প্রতিপাদ্যে এ কথা বোঝা যাচ্ছে যে, কোন কোন সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়ামত এমন কোন কোন লোককেও দান করেন, যে তার আমল বা কর্মের দ্বারা তার যোগ্য নয়, কিন্তু নিয়ামত প্রদত্ত হওয়ার পর যদি সে নিজের আমল বা কর্মধারা সংশোধন করে কল্যাণের দিকে ফিরানোর পরিবর্তে মন্দ কাজের দিকেই আরো বেশি উৎসাহী হয়ে পড়ে, তখন প্রদত্ত নিয়ামত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং সে লোক আল্লাহ্র আযাবের যোগ্য হয়ে পড়ে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের প্রতিটি কথাবার্তা শুনেন এবং তাদের সমস্ত আমল ও কার্যকলাপ জানেন। এতে কোন রকম ভুল-বিভ্রান্তির কোনই অবকাশ নেই।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ
رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ
كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ
فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ۝ فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ
فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝ وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ
قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْخَآئِنِيْنَ ۝

(৫৪) যেমন ছিল রীতি ফিরাউনের বংশধর এবং যারা তাদের পূর্বে ছিল. তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহকে। অতপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পাপের দরুন এবং ডুবিয়ে মেরেছি ফিরাউনের বংশধরদের। বস্তুত এরা সবাই ছিল জালিম। (৫৫) সমস্ত জীবের মাঝে আল্লাহ্‌র নিকট তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যারা অস্বীকারকারী হয়েছে, অতঃপর আর ঈমান আনেনি। (৫৬) যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ তাদের মধ্য থেকে অতপর প্রতিবার তারা নিজেদের কৃত চুক্তি লংঘন করে এবং তারা ভয় করে না। (৫৭) সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা তাই দেখে পালিয়ে যায়, তাদেরও যেন শিক্ষা হয়। (৫৮) তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এমনভাবে যেন হয়ে যাও তোমরা ও তারা সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধোঁকা-বাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সুতরাং এই পরিবর্তনের ব্যাপারেও) তাদের অবস্থা ফিরাউনের বংশধর এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থারই মত। তারা যখন তাদের পরওয়ারদিগারের আয়াত (তথা নিদর্শন) সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তখন সে জন্য আমি তাদেরকে তাদের (সেসব) পাপের দরুন ধ্বংস করে দিয়েছি। আর (তাদের মধ্যে) ফিরাউনের বংশধরদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছি। বস্তুত তারা (ফিরাউন ও তার পূর্ববর্তীরা) সবাই ছিল জালিম। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, এ সমস্ত কাফিরই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিকৃষ্টতর সৃষ্টি। (আর আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে এরা যখন এমন,) কাজেই এরা ঈমান আনবে না। তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আপনি তাদের কাছ থেকে (কয়েকবার) প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন (কিন্তু) প্রতিবারই তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি লংঘন করেছে (অথচ) তারা (এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ব্যাপারে) ভয় করে না। অতএব, তাদেরকে যদি আপনি কখনো যুদ্ধে ধরতে পারেন, তবে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে (তার মাধ্যমে) এ ধরনের অন্য লোকদেরকেও বিচ্ছিন্ন করে দিন, যাতে তারা এ কথা বুঝতে পারে (যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দরুনই এই আপদ; আর আমরা এমন করব না। এ নির্দেশটি হচ্ছে সে সময়ের জন্য যখন তারা প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে।) আর (প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞা লংঘন করা না হয়ে থাকলেও) যদি আপনি কোন জাতির (বা সম্প্রদায়ের) পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের) আশংকা করেন, তবে (এ অনুমতি রয়েছে যে,) আপনি সে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে দিতে পারেন। (অর্থাৎ সে প্রতিশ্রুতি বলবৎ না রাখার ঘোষণা এমনভাবে করে দিন যেন) আপনি এবং তারা (এই ঘোষণায়) সমান হয়ে যেতে পারেন। (এমনভাবে ঘোষণা না দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা আর) এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বরং শব্দাবলীও প্রায় তেমনি, যা এক আয়াত আগেই আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ কিন্তু এতদুভয় ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বিভিন্ন রকম। পূর্ববর্তী আয়াতে এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল যে, তাদের কুফরীই তাদের আযাবের কারণ হয়েছে। আর আলোচ্য এ আয়াতে উদ্দেশ্য হল এ কথা ব্যক্ত করা যে, যখন কোন জাতির উপর আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতরাজি দান করা হয়, কিন্তু তারা তার মূল্য বুঝে না এবং আল্লাহ্র দরবারে প্রণত হয় না, তখন সে নিয়ামতসমূহকে বালা-মসীবতে রূপান্তরিত করে দেয়াই হল আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ নিয়ম। সুতরাং ফিরাউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীরাও যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মূল্য দেয়নি, তখন তাদের কাছ থেকে নিয়ামত-সমূহ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তৎস্থলে তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হয়েছে। এছাড়া কোথাও কোথাও শব্দের কিছু পরিবর্তন করে বিশেষ বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, প্রথম আয়াতে ছিল كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আর এখানে বলা হয়েছে بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ এতে 'আল্লাহ্' শব্দের পরিবর্তে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা এত বড় জালিম ও ন্যায়বিমুখ যে, যে সত্তা তাদের 'রব' তথা পালনকর্তা, তাদেরকে প্রাথমিক অস্তিত্ব থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত যার নিয়ামত প্রতিপালন করেছে, এরা তাঁরই নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করেছে।

তাছাড়া পূর্ববর্তী আয়াতে—فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ বলা হয়েছিল, কিন্তু এখানে বলা হয়েছেঃ—فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ এতে পূর্বের সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ হয়ে গেছে। কারণ, প্রথম আয়াতে তাদেরকে আযাবে নিপতিত করার কথাই বলা হয়েছিল যার বিভিন্ন রূপ হতে পারত। জীবিত অবস্থায়ও নানা রকম বিপদাপদের সম্মুখীন করে কিংবা সম্পূর্ণভাবে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করে দিয়ে আযাবে পাকড়াও করা যেতে পারত। কাজেই এ আয়াতে اَهْلَكْنٰهُمْ বলে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, সে সমস্ত জাতির শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। আমি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি। প্রত্যেক

জাতির ধ্বংসের রূপও ছিল বিভিন্ন। ফিরাউন যেহেতু খোদায়ীর দাবিদার ছিল এবং তার সম্প্রদায়ও তার সত্যতা স্বীকার করত, সে জন্য বিশেষভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে ঃ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ— অর্থাৎ আমি ফিরাউনের অনুসারীদেরকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছি। অন্যান্য জাতির ধ্বংসের রূপ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়নি। তবে অন্য আয়াতে তার বিবরণও বিধৃত হয়েছে। কারো উপর ভূমিকম্প নাযিল হয়েছে, কেউ মাটিতে ধসে গেছে, কারো আকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে আবার কারো উপর তুফান চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর সবশেষে মক্কার মুশরিকদের উপর বদর প্রাঙ্গণে মুসলমানদের মাধ্যমে আযাব এসেছে।

এর পরবর্তী আয়াতে সেসব কাফির সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ— إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا এতে دَوَابّ শব্দটি دَابَّةٌ-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী। মানুষসহ যত প্রাণী ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ প্রচলনে এ শব্দটি বিশেষ করে চতুষ্পদ জীবের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু নির্বুদ্ধিতা ও অনুভূতিহীনতার দিক দিয়ে তাদের অবস্থা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার অপেক্ষাও নীচে নেমে গিয়েছিল, কাজেই তাদেরকে বোঝাতে গিয়ে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট যে, সমস্ত জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্টতর। আয়াতের শেষাংশে রয়েছে ঃ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ এরা ঈমান আনবে না। মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যেসব যোগ্যতা দান করেছিলেন, তারা সে সবই হারিয়ে ফেলেছে এবং চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত খানাপিনা ও নিদ্রা-জাগরণকেই জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে। কাজেই ঈমান পর্যন্ত তাদের পৌঁছা হবে না।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেছেন যে, এ আয়াতটি ইহুদী সম্প্রদায়ের ছ'জন লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

তদুপরি বাক্যটিতে সে সমস্ত লোককে আযাব থেকে বাদ দেয়াও উদ্দেশ্য, যারা যদিও তখন কাফিরদের সাথে মিলে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, কিন্তু পরবর্তী কোন সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়ে নিজেদের সাবেক ভ্রান্ত কাজ থেকে তওবা করে নেয়। বস্তুত হয়েছেও তাই। তাদের মধ্য থেকে বিরাট একদল মুসলমান হয়ে শুধু যে নিজেই সৎ ও পরহিযগার হয়েছে তাই নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণব্রত ও পরহিযগারীর আহবায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় আয়াত ঃ—اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ----এ আয়াতটি মদীনার ইহুদী এবং বনূ কোরায়যা ও বনূ নাযীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো মক্কার মুশরিকদের উপর বদর ময়দানে মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় আলোচনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতের কাফিরদের সাথে তাদের সামঞ্জস্যের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সে জালিম দলের আলোচনা করা হয়েছে যারা মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য আস্তীনের সাপে পরিণত হয় এবং যারা একদিকে মুসলমানদের বন্ধুত্ব ও সখ্যতার দাবিদার ছিল এবং অপরদিকে মক্কার কাফিরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত, ধর্মমতের দিক দিয়ে এরা ছিল ইহুদী। মক্কায় মুশরিকদের মাঝে আবু জাহ্‌ল যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, তেমনি মদীনার ইহুদীদের মধ্যে এ কাজের নেতা ছিল কা'আব ইবনে আশরাফ।

রসূলে করীম (সা) হিজরত করে মদীনায় চলে আসার পর মুসলমানদের ক্রম-বর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে এরা ভীত হলেও তাদের মনে ইসলামের প্রতি শত্রুতার এক দাবদাহ জ্বলেই যাচ্ছিল।

এদিকে ইসলামী রাজনীতির তাকাদা ছিল এই যে, যতটা সম্ভব মদীনার ইহুদীদেরকে কোন না কোন চুক্তি-প্রতিশ্রুতির আওতায় নিজেদের সাথে জড়িয়ে রাখা, যাতে তারা মক্কাবাসীদের মদীনায় এনে না তুলে। তাছাড়া ইহুদীরাও নিজেদের ভয়ের দরুন এরই আগ্রহী ছিল।

ইসলামী রাজনীতির প্রথম ধাপ ঃ ইসলামী জাতীয়তা ঃ রসূলে করীম (সা) মদীনায় আগমনের পর ইসলামী রাজনীতির সর্বপ্রথম বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের স্বদেশী ও স্বজাতীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের নামে এক নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের বিভিন্ন গোত্রকে ভাই-ভাইয়ে পরিণত করে দেন। আর হুযূর (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের সে সমস্ত বিরোধও দূর করে দেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে চলে আসছিল। পারস্পরিকভাবে এবং মুহাজিরীনদের সাথেও তিনি ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ ইহুদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি ঃ এ রাজনীতির দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায়, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল দুটি। ১. মক্কায় মুশরিকীন, যাদের অত্যাচার-উৎপীড়নে মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করছিল এবং ২. মদীনার ইহুদীবর্গ, যারা এখন মুসলমানদের প্রতিবেশী হয়েছিল। এদের মধ্য থেকে ইহুদীদের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করা হয়, যার একটা বিস্তারিত প্রতিজ্ঞাও লেখা হয়। এই চুক্তির প্রতি আনুগত্য মদীনা এলাকার সমস্ত ইহুদী, মুসলমান, আনসার ও মুহাজিরদের উপর আরোপ করা হয়।

চুক্তির পূর্ণ ভাষ্য ইবনে কাসীর 'আল্ বেদায়াহ্ ওয়ান্নেহায়াহ্' গ্রন্থে এবং সীরাতে ইবনে হেশাম প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুত এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদীনার ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুকে প্রকাশ্য কি গোপন সাহায্য করবে না। কিন্তু এরা বদর যুদ্ধের সময় সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে মক্কার মুশরিকদের অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে। তবে বদর যুদ্ধের ফলাফল যখন মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং কাফিরদের অপমানসূচক পরাজয়ের আকারে সামনে এসে যায়, তখন পুনরায় তাদের উপর মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতি প্রবল হয়ে ওঠে এবং তারা মহানবী (সা)-র দরবারে হাযির হয়ে ওযর পেশ করে যে, এবারে আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এবার বিষয়টি ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে আর এমনভাবে আমরা চুক্তি লংঘন করব না।

মহানবী (সা) ইসলামী গাম্ভীর্য, দয়া ও সহনশীলতার প্রেক্ষিতে যা তাঁর অভ্যাস ছিল আবারও তাদের সাথে চুক্তি নবায়ন করে নিলেন। কিন্তু এরা নিজেদের অসৎ স্বভাবের বাধ্য ছিল। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও ক্ষতিগ্রস্ততার কথা জানতে পেরে তাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের সর্দার কা'আব ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে মক্কার মুশরিকদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আশ্বাস দেয় যে, মদীনার ইহুদীরা তোমাদের সাথে থাকবে।

এটা ছিল তাদের দ্বিতীয়বারের চুক্তির লংঘন, যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে করেছে। উল্লিখিত আয়াতে এভাবে বারবার চুক্তি লংঘনের কথা উল্লেখ করে তাদের দুষ্কৃতির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছেন, কিন্তু এরা প্রতিবারই সে চুক্তি লংঘন করে চলছে। আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ অর্থাৎ এরা ভয় করে না। এর মর্মার্থ এও হতে পারে যে, এ হতভাগ্যরা যেহেতু দুনিয়ার লোভে উন্মাদ ও অজ্ঞান হয়ে আছে, তাদের মনে আখিরাতের কোন চিন্তাই নেই। কাজেই এরা আখিরাতের আযাব থেকে ভয় করে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এহেন দুরাচার ও চুক্তি লংঘনকারী লোকদের যে অশুভ পরিণতি পৃথিবীতেই হয়ে থাকে, এরা নিজেদের গাফিলতি ও অজ্ঞানতার দরুন সে ব্যাপারেও ভয় করে না।

অতপর সমগ্র বিশ্বই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে যে, এসব লোক নিজেদের দুষ্কর্মের শাস্তি পৃথিবীতেও ভোগ করেছে। আবূ জাহ্‌লের মত কা'আব ইবনে আশরাফ নিহত হয়েছে এবং মদীনার ইহুদীদের দেশছাড়া করা হয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রসূলকে সেসব চুক্তি লংঘনকারীদের সম্পর্কে একটি হিদায়তনামা দিয়েছেন, যার শব্দ নিম্নরূপ ঃ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي

فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ الْحَرْبِ تَثْقَفَنَّهُمْ এতে শব্দটির

অর্থ তাদের উপর ক্ষমতা লাভ করা। আর شَرِّدْ মূল ধাতু تشريد থেকে গঠিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ বিতাড়িত এবং বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে যে, "আপনি যদি কোন যুদ্ধে তাদের উপর ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়ে যান, তবে তাদের এমন কঠোর শাস্তি দিন, যা অন্যদের জন্যও নিদর্শন হয়ে যায়।" তাদের পশ্চাতে যারা তাদের সহায়তা ও ইসলামের শত্রুতায় লেগে আছে তারাও যেন একথা উপলব্ধি করে নেয় যে, এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই কল্যাণ। এর মর্ম হল এই যে, এদেরকে এমন শাস্তিই যেন দেয়া হয়, যা দেখে মক্কার মুশরিকীন ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হবে এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের মুকাবিলা করার সাহস করবে না।

আয়াতের শেষাংশে لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ বলে রব্বুল আলামীনের ব্যাপক রহমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সুকঠিন নিদর্শনমূলক শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয়; বরং এতে তাদেরই কল্যাণ যে, হয়তো বা এহেন অবস্থা দেখে এরা কিছুটা চেতনা ফিরে পাবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের সংশোধন করে নেবে।

সন্ধি চুক্তি বাতিল করার উপায়ঃ পঞ্চম আয়াতে রসূল মকবুল (সা)-কে যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বাতলে দেয়া হয়েছে। এতে চুক্তির অনুবর্তিতার গুরুত্ব বর্ণনার সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, কোন সময় যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা অর্থাৎ চুক্তি লংঘনের আশংকা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েয নয়। বরং এর বিশুদ্ধ পন্থা হ'ল এই যে, প্রতিপক্ষকে শান্ত পরিস্থিতিতে এবং অবকাশের অবস্থায় এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে যে, তোমাদের কুটিলতা ও বিরুদ্ধাচরণের বিষয়টি আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিংবা তোমাদের আচার-আচরণ আমাদের সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে, তাই আমরা আগামীতে এই চুক্তি পালনে বাধ্য থাকব না; তোমাদেরও সব রকম অধিকার থাকবে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পার। আয়াতের কথাগুলো হল এই ঃ

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝

অর্থাৎ আপনার যদি কোন চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা হয়, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে এমনভাবে ফিরিয়ে দেবেন, যেন আপনারা এবং তারা সমান সমান হয়ে যান। কারণ, আল্লাহ্ খেয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।

অর্থাৎ যে জাতির সাথে কোন সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তার মুকাবিলায় কোন রকম সামরিক পদক্ষেপ করা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না। যদি এ খেয়ানত কাফির শত্রুর সাথেও করা হয়, তবুও তা জায়েয নয়। অবশ্য যদি অপর পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা সৃষ্টি হয়, তবে এমনটি করা যেতে পারে যে, তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার মাধ্যমে অবহিত করে দেবেন যে, আগামীতে আমরা এ চুক্তির বাধ্য থাকব না। কিন্তু ঘোষণাটি এমনভাবে হতে হবে যেন মুসলমান ও অপর পক্ষ এতে সমান সমান হয়। অর্থাৎ এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি করা না হয় যে, এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পূর্ব থেকেই তাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে নেবে এবং তারা চিন্তামুক্ত হয়ে থাকার দরুন প্রস্তুতি নিতে পারবে না। বরং যে কোন প্রস্তুতি নিতে হয়, তা এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পরেই নেবেন।

এই হল ইসলামের ন্যায় ও সুবিচার যে, এতে বিশ্বাসঘাতক শত্রুদেরও হক বা অধিকারের হিফাযত করা হয় এবং মুসলমানদের উপরও তাদের মুকাবিলার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় যে, চুক্তি প্রত্যাহারের পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন রকম প্রস্তুতিও যেন গ্রহণ না করে।——(মাযহারী)

চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি বিস্ময়কর ঘটনাঃ আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ সুলায়ম ইবনে আমের-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য হযরত মু'আবিয়া (রা) এবং কোন এক সম্প্রদায়ের সাথে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছিল। হযরত মু'আবিয়া (রা) ইচ্ছা করলেন যে, এই চুক্তির দিনগুলোতে নিজেদের সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সে সম্প্রদায়ের কাছাকাছি নিয়ে রাখবেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু ঠিক যখন হযরত মু'আবিয়ার সৈন্য দল সেদিকে রওয়ানা হচ্ছিল। দেখা গেল, একজন বুড়ো লোক ঘোড়ায় চড়ে খুব উচ্চস্বরে না'রা, লাগিয়ে আসছেন যে, اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ لَّا غَدْرٌ অর্থাৎ না'রায়ে তকবীরের সাথে তিনি বললেন, সম্পাদিত চুক্তি পূরণ করা কর্তব্য। এর বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে জাতি-সম্প্রদায়ের সাথে কোন সন্ধি বা যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যায়, তার বিরুদ্ধে কোন গিঁঠ খোলা অথবা বাঁধাও চাই না। যা হোক, হযরত মু'আবিয়াকে বিষয়টি জানানো হলো। দেখা গেল কথাগুলো যিনি বলছেন, তিনি হলেন হযরত আমর ইবনে আম্বাসাহ্ সাহাবী। হযরত মু'আবিয়া ততক্ষণাৎ স্বীয় বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যাতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদে

সৈন্য স্থাপনার পদক্ষেপের দরুন খেয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়েন।—(ইবনে কাসীর)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۖ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ۚ
اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ
فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

(৫৯) আর কাফিররা যেন এ কথা মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে; কখনও এরা আমাকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না। (৬০) আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে। যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহ্‌র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যদের উপরও, যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ্‌র রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। (৬১) আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। (৬২) পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর কাফিররা যেন নিজেদের এমন মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে; নিশ্চয়ই তারা আমাকে (আল্লাহ্ তা'আলাকে) দুর্বল করতে পারে না যে, তাঁর আয়ত্তে না এসে থাকতে পারবে। বস্তুত তিনি তাদেরকে হয় দুনিয়াতেই শাস্তির সম্মুখীন করে দেবেন, না হয় আখিরাতে তো নিশ্চিতভাবেই তা করবেন। আর এসব কাফিরের (সাথে মুকাবিলা করার জন্য) তোমাদের দ্বারা যতটা সম্ভব অস্ত্রশস্ত্র এবং পালিত ঘোড়া প্রভৃতি

সাজসরঞ্জাম)-এর মাধ্যমে তোমরা (নিজেদের) প্রভাব তাদের উপর বিস্তার করে রাখতে পার, যারা (কুফরীর দরুন) আল্লাহ্ তা'আলার দুশমন (এবং তোমাদের সাথে থাকার দরুন) তোমাদের শত্রু (যাদের সাথে অহর্নিশি তোমাদের সংঘাত হতে থাকে) এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য কাফিরের উপরও (যাতে প্রভাব বিস্তার করে রাখতে পার) যাদেরকে তোমরা (নিশ্চিতভাবে) জানতে পার না, (বরং) তাদেরকে আল্লাহ্ই জানেন। (যেমন, রোম ও পারস্যের কাফিররা যাদের সাথে কখনও কোন সংঘাতের পালা পড়েনি, কিন্তু সাহাবাদের সাজসরঞ্জাম ও সৈন্য স্থাপনার নিপুণতা সমকালে তাদের মুকাবিলায়ও কাজে আসে এবং তাতে তাদের উপরও প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তাদের অনেকে মুকাবিলা করে পরাজিত হয় এবং অনেক জিযিয়া কর দানে সম্মত হয়ে যায়। প্রকৃত-পক্ষে তাও ছিল প্রভাবেরই প্রতিক্রিয়া)। আর আল্লাহ্র রাহে (যাতে জিহাদও অন্তর্ভুক্ত) যা কিছু ব্যয় করবে (এতে সেসব ব্যয়ও এসে গেছে, যা জিহাদের সাজসরঞ্জাম তৈরী করতে গিয়ে করা হয়) তা (অর্থাৎ তার সওয়াব) তোমাদেরকে (আখিরাতে) পুরো-পুরিই দেওয়া হবে এবং তোমাদের জন্য (তাতে) কোন রকম কমতি করা হবে না। বস্তুত যদি তারা (অর্থাৎ কাফিররা) সন্ধি করতে আগ্রহী হয়, তবে আপনার (জন্য)-ও (এ অনুমতি রয়েছে যে, আপনি যদি এতে কল্যাণ দেখতে পান, তবে) সে দিকে ঝুঁকে পড়তে পারেন। আর (যদি তাতে কল্যাণ থাকা সত্ত্বেও) এমন কোন সম্ভাবনা থাকে যে, এটা তাদের চালও হতে পারে, তবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করুন (এমন সম্ভাবনার দরুন কোন আশংকা করবেন না)। নিঃসন্দেহ তিনি যথেষ্ট শ্রবণকারী, মহাবিজ্ঞ (তিনি তাদের কথাবার্তা ও অবস্থা শোনেন ও জানেন। তিনি নিজেই তাদের ব্যবস্থা করে দেবেন)। আর যদি (বাস্তবিক পক্ষেই এ সম্ভাবনা যথার্থ হয় এবং সত্যি সত্যি যদি) তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার (সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের) জন্য যথেষ্ট। (যেমন ইতিপূর্বেও তিনি আপনার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং) তিনিই তো আপনাকে গায়েবী সাহায্য (অর্থাৎ ফেরেশতা) দ্বারা এবং বাহ্যিক সাহায্য (অর্থাৎ মুসলমানদের মাধ্যমে) শক্তি দান করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে সে সমস্ত কাফিরের বিষয় আলো-চনা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে বেঁচে গেছে কিংবা অংশ নিয়েও পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে, এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা যেন এমন ধারণা না করে যে, বাস্তবিক পক্ষেই আমরা বেঁচে গেছি। কারণ, বদরের যুদ্ধটি কাফিরদের জন্য এক আল্লাহ্র আযাব। এই পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং বলা হয়েছেঃ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ অর্থাৎ এরা নিজেদের চতুরতার দ্বারা আল্লাহ্কে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না, তিনি যখনই তাদেরকে

পাকড়াও করতে চাইবেন, তখন এরা এক পা'ও সরতে পারবে না। হয়তো-বা পৃথিবীতেই এরা ধরা পড়ে যেতে পারে, না হয় আখিরাতে তো তাদের আটকে পড়া অবধারিত।

এ আয়াত ইঙ্গিত করে দিচ্ছে যে, কোন অপরাধী পাপী যদি কোন বিপদ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তারপরেও যদি তওবা না করে বরং স্বীয় অপরাধে অটল-অবিচল থাকে, তবে তাকে এর লক্ষণ মনে করো না যে, সে কৃতকার্য হয়ে গেছে এবং চিরকালের জন্যই মুক্তি পেয়ে গেছে, বরং সে সর্বক্ষণই আল্লাহ্‌র হাতের মুঠায় রয়েছে এবং এই অব্যাহতি তার বিপদকে আরো বাড়াচ্ছে যদিও সে তা অনুভব করতে পারছে না।

জিহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা ফরয ঃ দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের শত্রুকে প্রতিরোধ ও কাফিরদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতির বিধান বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم অর্থাৎ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করার সাথে مَا اسْتَطَعْتُم এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে তোমাদেরও ততটাই অর্জন করতে হবে বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ যোগাড় করতে পার তাই সংগ্রহ করে নাও, তবে সেটুকুই যথেষ্ট---আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহায়তা তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

অতপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে مِن قُوَّةٍ অর্থাৎ মুকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত এবং শরীরচর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। কোরআন করীম এখানে তৎকালে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের কোন উল্লেখ করেনি, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছে যে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর-তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপরে বন্দুক-তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে বোমা, রকেটের যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এ সবকিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যে কোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হয় যদি তা এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফিরদের মুকাবিলা করা হবে, তাহলে তাও জিহাদেরই শামিল।

قوت শব্দটি ব্যাপকার্থে উল্লেখ করার পর প্রকৃষ্টভাবে বিশেষ قوت বা শক্তির কথাও বলা হয়েছে—وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ رباط শব্দটি ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর ربوط অর্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, ঘোড়া বাঁধা, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে বাঁধা ঘোড়া। তবে দু'এরই মর্ম এক। অর্থাৎ জিহাদের নিয়মে ঘোড়া পালা এবং সেগুলোকে বাঁধা কিংবা পালিত ঘোড়াগুলোকে এক জায়গায় এনে সমবেত করা। যুদ্ধোপকরণের মধ্যে বিশেষ করে ঘোড়ার উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, তখনকার যুগে কোন দেশ ও জাতিকে জয় করার জন্য ঘোড়াই ছিল সবচেয়ে কার্যকর ও উপকারী। তাছাড়া এ যুগেও বহু জায়গা রয়েছে, যা ঘোড়া ছাড়া জয় করা যাবে না। সে কারণেই রসূলে করীম (সা) বলেছেন, ঘোড়ার ললাটদেশে আল্লাহ্ তা'আলা বরকত দিয়েছেন।

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট ইবাদত ও মহাপুণ্য লাভের উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। তীর বানানো এবং চালানোর জন্য বিরাট বিরাট সওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে।

আর জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বযুগে ও সব জাতিতে আলাদা রকম, সেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

"মুশরিকীনদের বিরুদ্ধে জান-মাল ও মুখে জিহাদ কর।"—[আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) থেকে হাদীসটি রেওয়ায়েত করা হয়েছে]।

এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, জিহাদ ও প্রতিরোধ যেমন অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোন কোন সময় মুখেও হয়ে থাকে। তাছাড়া কলমও মুখেরই হুকুম রাখে। ইসলাম ও কোরআনের বিরুদ্ধে কাফির ও মুলহিদদের আক্রমণ এবং তার বিকৃতি সাধনের প্রতিরোধ মুখে কিংবা কলমের দ্বারা করাও এই সুস্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত আয়াতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশদানের পর সেসব সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করার ফায়দা এবং আসল উদ্দেশ্যও এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ অর্থাৎ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য

যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নয়, বরং কুফর ও শিরককে পরাভূত ও প্রভাবিত করে দেয়া। তা কখনো মুখ ও কলমের মাধ্যমেও হতে পারে। আবার অনেক সময় যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়। কাজেই পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরোধ করা ফরয।'

অতপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে যাদেরকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য হয় তাদের মধ্যে অনেককে মুসলমানরা জানে। আর তারা হল সেসব লোক, যাদের সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা চলছে। অর্থাৎ মক্কার কাফির ও মদীনার ইহুদীরা। এ ছাড়াও কিছু লোক রয়েছে, যাদেরকে এখনও মুসলমানরা জানে না। এর মর্ম হল সারা দুনিয়ার কাফির ও মুশরিকগণ, যারা এখনও মুসলমানদের মুকাবিলায় আসেনি। কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষ বাধতে পারে। কোরআন করীমের এ আয়াতটিতে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানরা যদি নিজেদের উপস্থিত শত্রুর মুকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে নেয়, তবে এর প্রভাব শুধু তাদের উপরই পড়বে না, বরং দূর-দূরান্তের কাফিরবর্গ; কিসরা ও কায়সার প্রভৃতির উপরেও পড়বে। বস্তুত হয়েছেও তাই। খোলাফায়ে-রাশেদীনের আমলে এরা সবাই পরাজিত ও প্রভাবিত হয়ে যায়।

যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয়; বরং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম অর্থ-সম্পদের দ্বারাই তৈরী করা যেতে পারে। সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র রাহে মাল বা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত এবং তার মহা প্রতিদানের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে যে, এ পথে তোমরা যাই কিছু ব্যয় করবে তার বদলা পুরোপুরিভাবে তোমাদেরকে দেওয়া হবে। কোন কোন সময় দুনিয়াতেই গনীমতের মালের আকারে এ বদলা মিলে যায়, না হয় আখিরাতের বদলা তো নির্ধারিত রয়েছেই---বলা বাহুল্য, সেটিই অধিকতর মূল্যবান।

তৃতীয় আয়াতে সন্ধির বিধি-বিধান এবং সে সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا — سَلْم সীন বর্ণের উপর যবর (َ) এবং سِلْم সীন বর্ণের নীচে যের (ِ) উভয় উচ্চারণেই সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যদি কাফিররা কোন সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে আপনাকেও তাই করা উচিত। এখানে নির্দেশবাচক পদ উত্তমতা বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মর্মার্থ এই যে, কাফিররা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে সেক্ষেত্রে আপনার এ অধিকার রয়েছে যে সন্ধি করায় যদি মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন, তাহলে সন্ধিও করতে পারেন।

আর اِنْ جَنَحُوْا এর শর্ত আরোপ করাতে বোঝা যাচ্ছে, সন্ধি তখনই করা যেতে পারে, যখন কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ পাবে। কারণ, তাদের আগ্রহ ব্যতীত যদি স্বয়ং মুসলমানরা সন্ধির উদ্যোগ করে, তবে এতে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।

তবে যদি এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মুসলমানরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য কোন পন্থা দেখা না যায়, তবে সেক্ষেত্রে ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ করাও জায়েয।

আর যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশে এমন কোন সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে, তারা মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে, শৈথিল্যে ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে, সেজন্য আয়াতের শেষাংশে রসূলে করীম (সা)-কে হিদায়ত দান করা হয়েছে যে, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করুন। কারণ, তিনিই যথার্থ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। তিনি তাদের কথাবার্তাও শোনেন এবং তাদের মনের গোপন ইচ্ছাও জানেন। তিনি আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কাজেই আপনি এহেন প্রমাণহীন আশঙ্কা-সম্ভাবনার উপর নিজ কাজের ভিত রাখবেন না। এসব আশঙ্কার বিষয়গুলোকে আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিন।

তারপর চতুর্থ আয়াতে বিষয়টিকে আরো কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ এ সম্ভাবনাই যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে গিয়ে তাদের নিয়ত যদি খারাপ থাকে এবং আপনাকে যদি এভাবে ধোঁকা দিতে চায়, তবুও আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আল্লাহ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহ্‌র সাহায্য-সমর্থনেই আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছে। তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে আপনার সহায়তা করেছেন, যা আপনার বিজয় ও কৃতকার্যতার ভিত্তি ও বাস্তব সত্য। আবার বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জামাতকে আপনার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা ছিল বাহ্যিক উপকরণ। সুতরাং যিনি প্রকৃত মালিক ও মহাশক্তিমান, যিনি বিজয় ও কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন, তিনি আজও শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার ব্যাপারে আপনার সাহায্য করবেন।

এ আল্লাহ্‌র ওয়াদার প্রেক্ষাপটেই এ আয়াত অবতরণের পর থেকে মহানবী (সা)-কে সমগ্র জীবনে এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি, যাতে শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার দরুন তাঁর কোন রকম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। সে কারণেই তফসীরবিদ আলিমরা বলেছেন, ওয়াদাটি মহানবী (সা)-র জন্য وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ওয়াদারই অনুরূপ। কাজেই এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত

সাহাবায়ে-কিরামকে নিশ্চিন্তভাবেই অব্যাহতি দিয়ে দেন। এতে এ কথাও বোঝা যায় যে, এ ওয়াদাটি বিশেষভাবে মহানবী (সা)-র জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।—(বয়ানুল কোরআন) অন্যান্য লোকদের পক্ষে বাহ্যিক ব্যবস্থা ও অগ্রপশ্চাৎ অবস্থা অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ
يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾
الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم
مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا
أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

(৬৩) আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু যমীনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৬৪) হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট। (৬৫) হে নবী, আপনি মুসলমানদের উৎসাহিত করুন জিহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি বর্তমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মুকাবিলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ' লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফিররের উপর। তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন। (৬৬) এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ' লোক বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দুশ'র উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও

তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর। আর আল্লাহ্ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (মুসলমানদের সাহায্যের মাধ্যম বানাবার জন্য) তাদের মনে একতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (কাজেই একথা একান্ত সুস্পষ্ট যে, যদি পারস্পরিক একতা সৃষ্টি না হত, তারা মিলিতভাবে কোন কাজ, বিশেষত দীনের সাহায্য করতে পারত না এবং তাদের মাঝে নেতৃত্বের লোভ, শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের প্রবলতা হেতু একতা সৃষ্টি এত কঠিন হয়ে দাঁড়াত যে,) যদি আপনি (পরিপূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপনার নিকট যথেষ্ট উপায়-উপকরণ থাকত, এমনকি এ কাজের জন্য) সারা দুনিয়ার বিষয়-সম্পদও যদি ব্যয় করতেন তবুও আপনি তাদের অন্তরে একতা সৃষ্টি করতে পারতেন না। কিন্তু (এটা) আল্লাহ্‌রই কাজ ছিল যে, তিনি তাদের মাঝে একতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহা পরাক্রমশালী (যা ইচ্ছা স্বীয় ক্ষমতায় করে ফেলতে সক্ষম এবং) সুকৌশলী (যেভাবে যে কাজ করা যথার্থ বলে মনে করেন, সেভাবেই তা সম্পাদন করেন। বস্তুত যখন আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার গায়েবী সাহায্য এবং মু'মিনদের মাধ্যমে আপনার সহায়তার বিষয় জানতে পারলেন, তখন) হে নবী, (এতেই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, প্রকৃতপক্ষে) আপনার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আর যেসব মু'মিন আপনার আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে (বাহ্যত) তারাও যথেষ্ট। হে নবী (সা) আপনি মু'মিনদের জিহাদে উৎসাহিত করুন (এবং এ ব্যাপারে এই বিধান তাদেরকে শুনিয়ে দিন যে,) তোমাদের মধ্যকার বিশ জন দৃঢ়চিত্ত লোক (নিজেদের থেকে দশ গুণ বেশি সংখ্যক শত্রুর উপর অর্থাৎ) দুশ'র উপর জয়ী হয়ে যাবে এবং (এমনিভাবে) যদি তোমাদের মধ্যে একশ' লোক থাকে, তাহলে হাজার কাফিরের উপর জয়ী হবে। তার কারণ, তারা (কাফিররা) এমন লোক যারা (দীন সম্পর্কে) কিছুই জানে না। (আর সে কারণেই এরা কুফরীর উপর আঁকড়ে আছে এবং সে কারণেই এরা কোন রকম গায়েবী সাহায্যও পায় না। ফলে এরা পরাজিত হয়ে যায়। সুতরাং নিজেদের তুলনায় দশ গুণ শত্রুর মুকাবিলায় পশ্চাদপসরণ করা তোমাদের জন্য জায়েয নয়। প্রথমে এই হুকুমই নাযিল হয়েছিল। অতপর সাহাবীদের জন্য বিষয়টি কঠিন বিবেচিত হলে তাঁরা নিবেদন করলেন। দীর্ঘদিন পর দ্বিতীয় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হল, যাতে প্রথমোক্ত হুকুম মনসূখ তথা রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ) এখন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য (কিছুটা) হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি বোঝেন যে, তোমাদের মধ্যে সাহসের (কিছুটা) অভাব রয়েছে। কাজেই (নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে,) তোমাদের মধ্যে একশ' দৃঢ়চিত্ত লোক হলে (তারা নিজদের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক শত্রুর উপর অর্থাৎ) দুশ'র উপর জয়ী হবে। আর (এমনি-ভাবে) যদি তোমরা এক হাজার হও, তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর। আর (আমি যে ধৈর্য ধারণকারীর শর্ত আরোপ করেছি তা এজন্য করেছি যে,) আল্লাহ্ ধৈর্য ধারণকারী (অর্থাৎ

যে মন ও পদক্ষেপে দৃঢ়তা অবলম্বন করে) তাদের সাথে রয়েছেন (অর্থাৎ তাদের সাহায্য করেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আন্‌ফালের উল্লিখিত চারটি আয়াতের প্রথমটিতে মুসলমানদের বিজয় ও কৃতকার্যতার প্রকৃত কারণ এবং তা অর্জনের উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। এরই পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলে করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই স্বীয় বিশেষ সাহায্যের মাধ্যমে মুসলমানদের দ্বারা আপনার সমর্থন ও সহায়তা জ্ঞাপন করেছেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলিম দলের দ্বারা কারও সাহায্য-সহায়তা যে এ দলের পারস্পরিক ঐকমত্য ও একতার উপরই নির্ভর করে, সেকথা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া একতার অনুপাতেই দলের শক্তি ও গুরুত্ব সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক একতা ও ঐক্যের সম্পর্ক সুদৃঢ় হলে গোটা দলও শক্তিশালী হতে পারে। পক্ষান্তরে ঐক্য সম্পর্কের বাঁধন যদি দুর্বল ও শিথিল হয়, তবে গোটা দলই নড়বড়ে ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সেই বিশেষ দানের কথাই আলোচনা করেছেন, যা মহানবী (সা)-র সাহায্যকল্পে সাধারণ মুসলমানদের প্রতি হয়েছিল—তাঁদের মনে পরিপূর্ণ ঐক্য ও পারস্পরিক প্রেম-ভালাবাসা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। অথচ মহানবী (সা)-র মদীনায় হিজরতের পূর্বে তাদের আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে কঠিন যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বিবাদ চলতে থাকে। মহানবী (সা)-র বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা এই জাতশত্রুদের পারস্পরিক গভীর বন্ধুতে পরিণত করে দিয়েছেন। মদীনায় নতুন ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপন ও তার স্থিতি-স্থায়িত্ব এবং শত্রুদের উপর বিজয় লাভের প্রকৃত অন্তর্নিহিত কারণ অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য-সহায়তাই ছিল, কিন্তু বাহ্যিক কারণটি ছিল মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্যবোধ ও সম্প্রীতি।

একই সাথে আয়াতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিভিন্ন মানুষের অন্তরকে মিলিয়ে দিয়ে তাদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করা কোন মানবীয় ক্ষমতার কাজ নয়; বরং এ বিষয়টি একমাত্র সে মহান সত্তারই কাজ, যিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। কোন মানুষ যদি সারা দুনিয়ার ধন-দৌলতও এ কাজে ব্যয় করে ফেলে যে, পারস্পরিক বিরোধ-সম্পন্ন লোকদের মনে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেবে, তবুও সে কখনও তাতে কৃতকার্য হতে পারবে না।

মুসলমানদের পারস্পরিক স্থায়ী ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রকৃত ভিত্তিঃ এতে এ কথাই বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের অন্তরে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার দান। তাছাড়া এতে একথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার না-ফরমানীর মাধ্যমে তাঁর দান অর্জন করা সম্ভব নয়; বরং তাঁর দান লাভের জন্য তার আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা একান্ত শর্ত।

দল বা ব্যক্তিবর্গের মাঝে একতা ও ঐকমত্য এমন একটি বিষয়, যার উপকারিতা ও প্রশংসনীয় হওয়ার ব্যাপারে কোন মযহাব ও ধর্ম, কিংবা কোন মতবাদেই কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। সেজন্যই এমন প্রতিটি লোক, যে মানুষের সংশোধন ও সংস্কার কামনা করে সে তাদের পরস্পরের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির উপর জোর দিয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ পৃথিবী এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত নয় যে, দীর্ঘস্থায়ী ও আন্তরিক ঐক্য বাহ্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জিত হয় না। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধান ও আনুগত্যের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। কোরআন হাকীম এই বাস্তবতার প্রতিই কয়েকটি আয়াতে ইঙ্গিত করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا এই আয়াতে মতবিরোধ ও অনৈক্য থেকে বাঁচার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যে, সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে অর্থাৎ কোরআন কিংবা ইসলামী শরীয়তকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তাহলে সবাই আপনা থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক যেসব বিরোধ রয়েছে, তা মিটে যাবে। অবশ্য মতের পার্থক্য থাকা পৃথক জিনিস; যতক্ষণ পর্যন্ত এ পার্থক্য তার সীমায় থাকে, ততক্ষণ তা বিবাদ-বিসংবাদ ও বিভেদের কারণ হতে পারে না। ঝগড়া-বিবাদ তখনই হয়, যখন শরীয়ত নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করা হয়। ইদানিং ঐক্য ঐক্য বলে সবাই চীৎকার করে, কিন্তু সবারই নিকট ঐক্যের অর্থ হয়ে থাকে এই যে, সবাই আমার কথা মেনে নিলেই ঐক্য হয়ে যাবে। অন্যেরাও ঐক্যের জন্য একই চিন্তায় থাকে, যেন মানুষ তাদের কথাই মেনে নেয়; এতেই ঐক্য সাধিত হবে। অথচ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যখন মতের পার্থক্য থাকা অপরিহার্য, তখন বলাই বাহুল্য যে, যদি প্রতিটি লোকই অন্যের সাথে ঐক্য সাধনকে নিজের মতকে অন্যদের মেনে নেওয়ার উপর নির্ভরশীল বিবেচনা করে, তবে কিয়ামত পর্যন্তও পারস্পরিক ঐক্য সাধিত হতে পারে না। বরং ইত্তেফাক বা ঐক্যের বিশুদ্ধ ও প্রকৃতি গ্রাহ্য রূপ সেটিই যা কোরআন বাতলে দিয়েছে। তা হল এই যে, উভয়ে মিলে তৃতীয় আরেক জনের কথা মেনে নাও। আর এই তৃতীয় জনই হবে এমন, যার মীমাংসা তথা সিদ্ধান্তে কোন ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। বস্তুত তিনি হতে পারেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। কাজেই উল্লিখিত আয়াতে হিদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, সবাই মিলে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তাহলেই সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের সমাধান হয়ে যাবে এবং পরিপূর্ণ ঐক্য সাধিত হবে।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا অর্থাৎ যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরস্পরের মাঝে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব সৃষ্টি করে দেন। এ

আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মনের মাঝে প্রকৃত সম্প্রীতি ও সদ্ভাব সৃষ্টির মূল পন্থা হল ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি নিষ্ঠা। এর অবর্তমানে কোথাও কখনও কৃত্রিম কোন উপায়ে যদি কোন রকম ঐক্য সাধিত হয়েও যায়, তবে তা হবে একান্তই ভিত্তিহীন ও দুর্বল। সামান্য আঘাতেই তা ভেঙে শেষ হয়ে যাবে, যা সারা দুনিয়ার জাতিসমূহ নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা অহরহ প্রত্যক্ষ করে আসছে। সারকথা হল এই যে, এই আয়াতে রসূলে করীম (সা)-এর উপর মহান পরওয়ারদিগারের সে সমস্ত দানের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে, যা মদীনার সমস্ত গোত্র-সম্প্রদায়ের মনে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে মহানবী (সা)-র সাহায্য-সহায়তার উদ্দেশ্যে তাদেরকে একটি লৌহ প্রাচীরের মত করে দেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় আয়াতেও একই প্রসঙ্গ সার-সংক্ষেপ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে রসূলে করীম (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনার জন্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা এবং বাহ্যিকভাবে মু'মিনদের জামাত যথেষ্ট। শত্রুদের সংখ্যা ও আয়োজন যত বড়ই হোক না কেন আপনি তাতে ভীত হবেন না। তফসীরকার মনীষীবৃন্দ বলেছেন যে, এ আয়াতটি বদর যুদ্ধকালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বাহ্নে নাযিল হয়েছিল, যাতে স্বল্প সংখ্যক নিঃসম্বল মুসলমান প্রতিপক্ষের বিপুলতা ও আয়োজন দেখে প্রভাবিত না হয়ে পড়েন।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের জন্য একটি যুদ্ধ নীতির আলোচনা করা হয়েছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় তাদেরকে কতটা দৃঢ়তা অবলম্বন করা ফরয এবং কোন পর্যায়ে পশ্চাদপসরণ করা পাপ। পূর্ববর্তী আয়াত ও ঘটনার বিবরণে এর বিশদ আলোচনা এসে গেছে যে, আল্লাহ্র গায়েবী সাহায্য মুসলমানদের সাথে থাকে বলে তাদের ব্যাপারটি পৃথিবীর সাধারণ জাতি সম্প্রদায়ের মত নয়; এদের অল্প সংখ্যকও অধিক সংখ্যকের উপর বিজয় অর্জন করতে পারে। যেমন, কোরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ অর্থাৎ বহু স্বল্প সংখ্যক দল আল্লাহর হুকুমে অধিক সংখ্যক প্রতিপক্ষের উপর বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়ে যায়।

সেজন্যই ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ বদর যুদ্ধে দশ জন মুসলমানকে একশ' লোকের সমান সাব্যস্ত করে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়চিত্ত লোক থাক, তাহলে দু'শ শত্রুর উপর জয়ী হয়ে যাবে। আর তোমরা যদি একশ জন হও, তবে এক হাজার কাফিরের বিরুদ্ধে জয়ী হবে।"

এতে সংবাদ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একশ মুসলমান এক হাজার কাফিরের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হল এই নির্দেশ দান যে, একশ মুসলমানকে এক হাজার কাফিরের মুকাবিলা করতে গিয়ে পালিয়ে যাওয়া জায়েয নয়। এর কারণ, যাতে মুসলমানদের মন এ সুসংবাদে দৃঢ় হয়ে যায় যে, আল্লাহ

আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন। যদি নির্দেশাত্মক বাক্যের মাধ্যমে এ হুকুম দেওয়া হতো, তবে প্রকৃতিগতভাবেই তা ভারী বলে মনে হতে পারত।

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের যুদ্ধ গয্‌ওয়ায়ে বদর এমন এক অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল, যখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প। তাও আবার সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। বরং জরুরী ভিত্তিতে যাঁরা তৈরি হতে পেরেছিলেন শুধু তাঁরাই এ যুদ্ধের সৈনিক হয়েছিলেন। কাজেই এ যুদ্ধে একশ' মুসলমানকে এক হাজার কাফিরের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এমনই ভঙ্গিতে দেওয়া হয়, যার সাথে সাহায্যের ওয়াদাও বিদ্যমান থাকে।

চতুর্থ আয়াতে পরবর্তীকালের জন্য এ নির্দেশ রহিত করে দ্বিতীয় নির্দেশ জারী করা হয় যে---

"এখন আল্লাহ তা'আলা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে সাহসের কমতি দেখা দিয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি একশ লোক দৃঢ়চিত্ত থাক, তবে তারা দু'শ লোকের উপর জয়ী হবে।"

এখানেও উদ্দেশ্য হল এই যে একশ' মুসলমানের পক্ষে দু'শ কাফিরের মুকাবিলা করতে গিয়ে পালিয়ে আসা জায়েয নয়। প্রথম আয়াতে একজন মুসলমানের জন্য দশজন অমুসলমানের মুকাবিলা থেকে পালিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। আর এ আয়াতে একজন মুসলমানকে দু'জন অমুসলমানের মুকাবিলা থেকে পালিয়ে আসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুত এটাই হল এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ নির্দেশ যা সর্বকালেই বলবৎ থাকবে।

এখানেও নির্দেশকে নির্দেশ আকারে নয়; বরং সংবাদ ও সুসংবাদ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন মুসলমানের জন্য দু'জন কাফিরের বিরুদ্ধে অটল থাকার নির্দেশ দান (নাউযুবিল্লাহ) কোন রকম অন্যায় কিংবা যবরদস্তিমূলক নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মধ্যে তাদের ঈমানের দৌলতে এমন শক্তি দিয়ে রেখেছেন যে, তারা একজনই দুজনের সমান হয়ে থাকে।

কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সাহায্য-সহায়তা দানের সুসংবাদটি এই শর্তের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, এসব মুসলমানকে দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। বলা বাহুল্য, যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের প্রাণকে বিপদের সম্মুখীন করে দিয়ে দৃঢ়চিত্ত থাকা শুধুমাত্র তাদেরই পক্ষে সম্ভব, যাদের পরিপূর্ণ ঈমান থাকবে। কারণ, পরিপূর্ণ ঈমান মানুষকে শাহাদতের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে আর এই অনুপ্রেরণা তাদের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

আয়াতের শেষভাগে সাধারণ নীতি আকারে বলা হয়েছেঃ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصّٰبِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে রয়েছেন। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীও অন্তর্ভুক্ত এবং শরীয়তের সাধারণ হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতায় দৃঢ়তা অবলম্বনকারীরাও শামিল। তাদের সবার জন্যই আল্লাহ তা'আলার সঙ্গদানের এ প্রতিশ্রুতি। আর এই আল্লাহ্র সঙ্গই প্রকৃতপক্ষে তাদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের মূল রহস্য। কারণ, যে ব্যক্তি একক ক্ষমতার অধিকারী পরওয়ারদিগারের সঙ্গলাভে সমর্থ হবে, তাকে সারা বিশ্বের সমবেত শক্তিও নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দু নাড়াতে পারে না।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ
تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ۝ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ۝ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(৬৭) নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদেরকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ্ চান আখিরাত। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা। (৬৮) যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সে জন্য বিরাট আযাব এসে পৌঁছাত। (৬৯) সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল মেহেরবান।

তফসীরের সার সার-সংক্ষেপ

[হে মুসলমানগণ, তোমরা কিছু বিনিময় নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য নবী করীম (সা)-কে যে পরামর্শ দিচ্ছিলে, তা ছিল একান্তই অসময়োচিত। কারণ,] এটা নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তাঁর কাছে বন্দী থেকে যাবে বরং তাদের হত্যা করে ফেলাই সমীচীন, যতক্ষণ না তারা পৃথিবীতে উত্তমরূপে (কাফিরদের) রক্তপাত ঘটিয়ে নেবে। (কারণ, জিহাদের নির্দেশের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হল দাঙ্গা-হাঙ্গামা তথা ফিতনা-ফাসাদকে প্রতিহত করা। বস্তুত যতক্ষণ পর্যন্ত না কাফিরদের দাপট সম্পূর্ণভাবে

ভেঙে যাবে দাঙ্গা-ফাসাদ দূর হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এমনটি হওয়ার পূর্বে বন্দীদের জীবিত ছেড়ে দেয়া, তাঁর সংস্কারমূলক মর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। অবশ্য এমন শক্তি সঞ্চিত হয়ে যাওয়ার পর বন্দীদের হত্যা করা অপরিহার্য নয়। বরং তখন-কার জন্য অন্যান্য বৈধ পন্থাও রয়েছে। অতএব তোমরা তাঁকে এহেন অসঙ্গত পরামর্শ কেন দিলে?) তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, আর সেজন্যই ফিদইয়া বা বিনিময়ের পরামর্শ দিয়েছ অথচ আল্লাহ্ আখিরাত (-এর মঙ্গল) চান (আর তা কাফিরদের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পরাজয়বরণ করার উপরই নির্ভর করে। তাতে ইসলামের নূর ও হিদায়ত বিস্তার লাভ করবে এবং অবাধে তারা প্রচুর সংখ্যায় মুসলমান হয়ে মুক্তি লাভ করবে।) আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রম ও হিকমতের অধিকারী। (তিনিই তোমাদের কাফিরদের উপর বিজয় দান করে থাকেন এবং এই বিজয়ের মাধ্যমে তোমাদের সম্পদশালী করে দেন। অবশ্য এতে অনেক সময় বিশেষ কোন হিকমতের প্রেক্ষিতে বিলম্বও ঘটে। তোমাদের দ্বারা এমন অপছন্দনীয় কাজ সংঘটিত হয়েছে যে,) যদি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক (এ সমস্ত বন্দীদের মধ্যে অনেকের মুসলমান হয়ে যাওয়া এবং তাতে করে সম্ভাব্য দাঙ্গা-ফাসাদ সংঘটিত না হওয়ার ব্যাপারে) নিয়তি নির্ধারিত হয়ে না যেত, তবে তোমরা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছ সেজন্য তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আরোপিত হত। (কিন্তু যেহেতু কোন দাঙ্গা-ফাসাদ সংঘটিত হয়নি এবং ঘটনা-চক্রে তোমাদের পরামর্শ সঠিক হয়ে গেছে, কাজেই তোমরা শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করেছ। অর্থাৎ আমি এই ফিদইয়া তথা মুক্তিপণকে মোবাহ্ করে দিয়েছি।) সুতরাং (তোমরা তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসাবে) যা কিছু গ্রহণ করেছ, সেগুলোকে হালাল ও পাক-পবিত্র বস্তু মনে করেই খাও এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাক (এবং ভবিষ্যতে এসব ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল. করুণাময়। (তোমাদের গোনাহ্ মাফ করে দিয়ে তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীলতা প্রকাশ করেছেন এবং মুক্তিপণ হিসাবে গৃহীত বস্তু-সামগ্রীকে তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়ে তোমাদের উপর বিরাট করুণা করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতটি গয্ওয়ায়ে বদরের বিশেষ এক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এগুলোর তফসীর করার পূর্বে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য রেওয়ায়েত ও হাদীসের মাধ্যমে ঘটনাটি বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়।

ঘটনাটি হল এই যে, বদর যুদ্ধটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ, যা একান্তই দৈবাৎ সংঘটিত হয়। তখনও জিহাদ সংক্রান্ত হুকুম-আহকামের কোন বিস্তারিত বিবরণ কোরআনে অবতীর্ণ হয়নি। যেমন, জিহাদ করতে গিয়ে গনীমতের মাল হস্তগত হলে তা কি করতে হবে, শত্রুসৈন্য নিজেদের আয়ত্তে এসে গেলে, তাকে বন্দী করা জায়েয হবে কিনা এবং বন্দী করে ফেললে তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে প্রভৃতি বিষয় ইতিপূর্বে কোরআনে আলোচনা করা হয়নি।

পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়া (আ)-র শরীয়তে গনীমতের দ্বারা উপকৃত হওয়া কিংবা সেগুলো ব্যবহার করা হালাল ছিল না। বরং গনীমতের যাবতীয় মালামাল একত্র করে কোন ময়দানে রেখে দিতে হতো। আর আল্লাহ্‌র রীতি অনুযায়ী একটি আগুন এসে সেগুলো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিত। একেই মনে করা হতো জিহাদ কবুল হওয়ার লক্ষণ। গনীমতের মালামাল জ্বালানোর জন্য যদি আস্‌মানী আগুন না আসত, তাহলে বোঝা যেত যে, জিহাদে এমন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়ে থাকবে, যার ফলে তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়নি।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সেগুলোর মাঝে এও একটি যে, কাফিরদের থেকে প্রাপ্ত গনীমতের মালামাল কারো জন্য হালাল ছিল না, কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল করে দেয়া হয়েছে। গনীমতের মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্‌র তো জানা ছিল, কিন্তু গযওয়ায়ে বদরের পূর্ব পর্যন্ত এর হালাল হওয়ার ব্যাপারে মহানবী (সা)-র উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। অথচ গযওয়ায়ে বদরে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের ধারণা-কল্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। শত্রুরা বহু মালামালও ফেলে যায়, যা গনীমত হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং তাদের বড় বড় সত্তর জন সর্দারও মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসে। কিন্তু এতদুভয় বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে কোন ওহী তখনও আসেনি।

সে কারণেই সাহাবায়ে কিরামের প্রতি এহেন ত্বরান্বিত পদক্ষেপের দরুন ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়। এই ভর্ৎসনা ও অসন্তুষ্টিই এই ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বাহ্যত দুটি অধিকার মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এই ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে, বিষয়টির দুটি দিকের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একটি পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দনীয়। তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সহীহ্ ইবনে হাব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আলী মুর্তজা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিবরাঈল-আমীন রসূলে করীম (সা)-এর নিকট আগমন করে তাঁকে আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ শোনান যে, আপনি সাহাবায়ে কিরামকে দুটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দান করুন। তার একটি হলো এই যে, এই যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করে শত্রুর মনোবলকে চিরতরে ভেঙে দেবে। আর দ্বিতীয়টি হলো এই যে, তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। তবে দ্বিতীয় অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে একথা অবধারিত হয়ে রয়েছে যে, এর বদলা হিসাবে আগামী বছর মুসলমানদের এমনি সংখ্যক লোক শহীদ হবেন, যে সংখ্যক বন্দী আজ মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। এভাবে যদিও ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সাহাবায়ে কিরামকে এ দুটি থেকে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয় কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সত্তর জন সাহাবার শাহাদাতের ফয়সালার বিষয় উল্লেখ করার মাঝে অবশ্যই

এই ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল যে, এ দিকটি আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় নয়। কারণ, এটি যদি পছন্দই হতো তবে এর ফলে সত্তর জন মুসলমানের খুন অবধারিত হতো না।

সাহাবায়ে কিরামের সামনে এ দুটি বিষয়ই যখন ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পেশ করা হলো, তখন কোন কোন সাহাবীর ধারণা হলো যে, এদেরকে যদি মুক্তিপণ দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে হয়তো এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোন সময় মুসলমান হয়ে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হল জিহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারিতা। দ্বিতীয়ত এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলমানরা যখন নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সত্তর জনের আর্থিক মুক্তিপণ অর্জিত হলে এ কষ্টও লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে জিহাদের প্রস্তুতির জন্যও সহায়ক হতে পারে। রইল সত্তর জন মুসলমানের শাহাদতের বিষয়! প্রকৃতপক্ষে এটাও একটা বিপুল গৌরবের বিষয়। এতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে সিদ্দীকে আকবর (রা) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম এ মতই প্রদান করলেন যে, বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হোক। শুধুমাত্র হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) ও হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা) প্রমুখ কয়েকজন এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা করার পক্ষে মত প্রদান করলেন। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত সৌভাগ্য-ক্রমে ইসলামের মুকাবিলায় শক্তি ও সামর্থ্যের বলে যোগদানকারী সমস্ত কুরাইশ সর্দার এখন মুসলমানদের হস্তগত হলেও পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একান্তই কল্পনানির্ভর। কিন্তু ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করবে সে ধারণাই প্রবল।

রসূলে করীম (সা) যিনি রাহমাতুললিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন এবং আপাদমস্তক করুণার আধার ছিলেন, তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দুটি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ করে নিলেন, যাতে বন্দীদের ব্যাপারে রহমত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও ছিল সহজ। অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত ক'রে দেওয়া। তিনি সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযম (রা)-কে উদ্দেশ করে বললেন ঃ لو اتفقتما ما خالفتكما— অর্থাৎ তোমরা উভয়ে যদি কোন বিষয়ে একমত হয়ে যেতে, তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করতাম না। (মাযহারী) তাঁদের মত-বিরোধের ক্ষেত্রে বন্দীদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন করাই ছিল সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও করুণার তাকাদা। অতএব, তাই হল। আর তারই পরিণতিতে পরবর্তী বছর আল্লাহ্‌র বাণী মুতাবিক সত্তর জন মুসলমানের শাহাদতের ঘটনা সংঘটিত হল।

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا আয়াতে সে সমস্ত সাহাবাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার রসূলকে অসংগত পরামর্শ দান করছো। কারণ, শত্রুদের বশে পাওয়ার পরেও তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্টকর

শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন নবীর পক্ষেই শোভন নয়।

এ আয়াতে حَتّٰى تُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে اِثْخَانٌ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারও শক্তি ও দম্ভকে ভেঙে দিতে গিয়ে কঠোরতর ব্যবস্থা নেয়া। এ অর্থের তাকীদ বোঝাবার জন্য فِى الْاَرْضِ বাক্যের প্রয়োগ। এর সারার্থ হল এই যে, শত্রুর দম্ভকে ধূলিসাৎ করে দেন।

যেসব সাহাবা মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাঁদের সে মতে যদিও নির্ভেজাল একটি দীনী প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল---অর্থাৎ মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলমান হয়ে যাবার আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্মস্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থ-সম্পদ এসে যাবে। অথচ তখনও পর্যন্ত কোন সরাসরি 'নছ' বা আল্লাহ্‌র বাণীর মাধ্যমে যে সমস্ত মালামালের বৈধতা প্রমাণিত ছিল না। কাজেই মানুষের যে সমাজটিকে রসূলে করীম (সা)-এর তত্ত্বাবধানে এমন মানদণ্ডের উপর গঠন করা হচ্ছিল, যাতে তাদের মর্যাদা ফেরেশ-তাদের চেয়েও বেশি হবে, তাদের পক্ষে গনীমতের সে মাল-সামান বা দ্রব্যসামগ্রীর আগ্রহকেও এক রকম পাপ বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া যে কাজে বৈধাবৈধের সমন্বয় থাকে, তার সমষ্টিকে অবৈধ বলেই বিবেচনা করা হয়। সে জন্যই সাহাবায়ে কিরামের সে কাজটিকে ভৎর্সনাযোগ্য সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে ঃ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ - وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ তোমরা দুনিয়া কামনা করছ অথচ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্ চান তোমরা যেন আখিরাত কামনা কর। এখানে ভৎর্সনা হিসাবে শুধুমাত্র তাদের সে কাজের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা ছিল অসন্তুষ্টির কারণ। বন্দীদের মুসলমান হওয়ার আশা সংক্রান্ত দ্বিতীয় কারণটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের মত নিঃস্বার্থ, পবিত্রাত্মা দলের পক্ষে এমন দ্ব্যর্থবোধক নিয়ত করা যাতে কিছু পার্থিব স্বার্থও নিহিত থাকবে গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে ভৎর্সনা ও সতর্কীকরণের লক্ষ্যস্থল হলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা)। যদিও রসূলে করীম (সা) নিজেও তাঁদের মতামত সমর্থন করে তাদের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে কাজটি ছিল একান্তভাবেই তাঁর রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। সে কারণেই তিনি মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সে দিকটিই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, যা বন্দীদের পক্ষে সহজ ও দয়াভিত্তিক।

আয়াতের শেষাংশে وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রমশীল, হেকমতওয়ালা; আপনারা যদি তাড়াহুড়া না করতেন, তবে তিনি স্বীয় আগ্রহে পরবর্তী বিজয়ে আপনাদের জন্য ধন-সম্পদের ব্যবস্থাও করে দিতেন।

দ্বিতীয় আয়াতটিতেও এই ভর্ৎসনারই উপসংহারস্বরূপ বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক যদি নিয়তি নির্ধারিত হয়ে না যেত, তবে তোমরা যে কাজ করেছ, অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, সেজন্য তোমাদের উপর কোন বড় রকমের শাস্তি সংঘটিত হতো।

উল্লিখিত নির্ধারিত নিয়তির তাৎপর্য সম্পর্কে তিরমিযী গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) বলেছেন, তোমাদের পূর্বে কোন উম্মতের জন্য গনীমতের মালামাল হালাল ছিল না। বদরের ঘটনাকালে মুসলমানরা যখন গনীমতের মালামাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে, অথচ তখনও তার বৈধতার কোন নির্দেশ নাযিল হয়নি, তখন ভর্ৎসনাসূচক এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, গনীমতের মালামালের বৈধতাসূচক নির্দেশ আসার প্রাক্কালে মুসলমানদের এহেন পদক্ষেপ এমনই পাপ ছিল, যার দরুন আযাব নেমে আসাই উচিত ছিল, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার এই হুকুমটি 'লওহে মাহ্‌ফুযে' লিপিবদ্ধ ছিল যে, এই উম্মতের জন্য গনীমতের মালকে হালাল করে দেয়া হবে, সেহেতু মুসলমানদের এ ভুলের জন্য আযাব নাযিল হয়নি।—(মাযহারী)

কোন কোন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসূলে করীম (সা) বলেছিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার আযাব একেবারেই সামনে এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তা থামিয়ে দেন। সে আযাব যদি আসত তাহলে উমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুআয ছাড়া কেউই তা থেকে অব্যাহতি পেত না।" এতে প্রতীয়মান হয়, মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের মুক্ত করে দেয়াই ছিল ভর্ৎসনার কারণ। অথচ তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুসারে বোঝা যাচ্ছে যে, গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করাই ছিল ভর্ৎসনার হেতু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ বা পার্থক্য নেই। বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করাও ছিল গনীমতের মাল সংগ্রহেরই অংশবিশেষ।

মাস'আলা ঃ উল্লিখিত আয়াতে মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তিদান ও গনীমতের মালামাল সংগ্রহের কারণে ভর্ৎসনা নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র আযাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, এবং পরে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতে ভবিষ্যতে এ সমস্ত ব্যাপারে মুসলমানদের কোন্ পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। সে কারণেই পরবর্তী আয়াতে গনীমতের মালামাল সংক্রান্ত মাসআলাটি পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ অর্থাৎ

গনীমতের যে সব মালামাল তোমাদের হস্তগত হবে, এখন থেকে সেগুলো তোমরা খেতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জন্যও তা হালাল করে দেয়া হল। কিন্তু তার পরেও এতে একটি সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, গনীমতের মাল হালাল হওয়ার নির্দেশটি তো এখন হলো, কিন্তু ইতিপূর্বে যেসব মালামাল সংগ্রহ করে নেয়া হয়েছিল হয়তো সেগুলোতে কোন রকম কারাহাত বা দোষ থাকতে পারে। সেজন্যই এর পর حلالا طيبا বলে সে সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে যে, যদিও বৈধতার হুকুম নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে গনীমতের মাল সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া জায়েয ছিল না, কিন্তু এখন যখন গনীমতের মালের বৈধতা সংক্রান্ত হুকুম এসে গেছে, তখন সংগৃহীত মালামালও নির্দোষভাবেই হালাল।

মাস'আলা ঃ এখানে উসূলে ফিকাহ্ একটি বিষয় লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। তা হল এই যে, যখন কোন অবৈধ পদক্ষেপের পর স্বতন্ত্র কোন আয়াতের মাধ্যমে সে বিষয়টিকে হালাল করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তখন তাতে পূর্ববর্তী পদক্ষেপের কোনই প্রভাব থাকে না; সে মালামাল যথার্থভাবেই পবিত্র ও হালাল হয়ে যায়। যেমনটি এখানে (অর্থাৎ গনীমতের মালের ব্যাপারে) হয়েছে। কিন্তু এরই অন্য একটি উদাহরণ হলো এই যে, কোন ব্যাপারে পূর্ব থেকেই হয়তো নির্দিষ্ট হুকুম নাযিল হয়েছিল কিন্তু আনুষঙ্গিক কাজটি সম্পাদন করে ফেলার পর জানা গেল যে, আমাদের কাজটি কোরআন ও সুন্নাহ্র অমুক হুকুমের বিরোধী ছিল, তখন এমতাবস্থায় হুকুমটি প্রকাশিত হবার পর কৃত ভুলের জন্য ক্ষমা করা হলেও সে মালামাল আর হালাল থাকে না।—নূরুল আনওয়ার ঃ মোল্লা জীওয়ান। আলোচ্য আয়াতে গনীমতের মালামালকে যদিও 'হালালে-তাইয়্যেব' তথা পবিত্র-হালাল বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, কিন্তু আয়াতের শেষাংশে এই বাধ্যবাধকতাও আরোপ করা হয়েছে وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গনীমতের মাল যদিও হালাল করা হয়েছে কিন্তু তা একটি বিশেষ আইনের আওতায় করা হয়েছে। সে আইনের বিরুদ্ধাচরণ করা কিংবা নিজের অধিকারের অতিরিক্ত গ্রহণ করা বৈধ নয়।

এখানে বিষয় ছিল দু'টি। (১) গনীমতের মালামাল এবং (২) বন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া। প্রথম বিষয় সম্পর্কে এ আয়াত পরিষ্কার বিধান বলে দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি এখনও পরিষ্কার হয়নি। এ সম্পর্কে সূরা মুহাম্মদে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ - حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا অর্থাৎ যখন যুদ্ধে কাফিরদের সাথে তোমাদের মুকাবিলা হবে তখন তাদের হত্যা কর, যতক্ষণ না তোমরা রক্তপাতের মাধ্যমে তাদের শক্তি

সামর্থ্যকে ভেঙে চুরমার করে দাও। তারপর তাদেরকে বাঁধ শক্তভাবে। অতপর হয় তাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্বক কোন রকম বিনিময় না নিয়েই মুক্ত করে দাও, অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত কর যতক্ষণ না যুদ্ধে তার অস্ত্র ফেলে দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, গযওয়ায়ে বদরে বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তিদানের প্রেক্ষিতে ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়। এটি ছিল ইসলামের প্রথম জিহাদ। তখনও পর্যন্ত কাফিরদের শক্তি ও ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। ঘটনাচকে তাদের উপর এক বিপদ এসে উপস্থিত হয়। তারপর যখন ইসলাম ও মুসলমানদের পরিপূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ সে হুকুম রহিত করার উদ্দেশ্যে সূরা মুহাম্মদের উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন। এতে মহানবী (সা) এবং মুসলমানদেরকে বন্দীদের সম্পর্কে চারটি ক্ষমতা দান করা হয়। তা হল এই ঃ

ان شاءوا قتلوهم، وان شاءوا استعبدوهم، وان شاءوا افادوهم، وان شاءوا اعتقوهم -

অর্থাৎ (১) ইচ্ছা করলে সবাইকে হত্যা করতে পার, (২) ইচ্ছা করলে দাস বানিয়ে নিতে পার, (৩) ইচ্ছা করলে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে পার এবং (৪) ইচ্ছা করলে মুক্তিপণ ব্যতীতই তাদের মুক্ত করে দিতে পার।

উল্লিখিত চারটি ক্ষমতার প্রথম দুটির ব্যাপারে সমগ্র উম্মতের ইজমা ও ঐকমত্য রয়েছে যে, মুসলমানদের আমীরের তথা নেতার জন্য সমস্ত বন্দীকে হত্যা কিংবা দাস বানিয়ে নেয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে বিনিময় না নিয়ে কিংবা বিনিময় নিয়ে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম মালেক (র), ইমাম শাফেয়ী (র), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), ইমাম সওরী ও ইসহাক (র) এবং তাবেয়ীনদের মধ্যে হযরত হাসান বসরী ও আ'তা (র)-এর মতে বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে অথবা তা না নিয়ে ছেড়ে দেয়া কিংবা মুসলমান বন্দীদের সাথে বিনিময় করাও মুসলমানদের আমীরের জন্য জায়েয।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, আওযায়ী, কাতাদাহ্, যাহ্হাক, সুদ্দী ও ইবনে জুরায়েজ (র) প্রমুখ বলেন, কোন রকম বিনিময় নানিয়ে ছেড়ে দেয়া তো মোটেই জায়েয নয়, ইমাম আবূ হানীফা (র)-র প্রসিদ্ধ মাযহাব অনুযায়ী মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়াও জায়েয নয়। অবশ্য 'সিয়ারে কবীরে'র রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, মুসলমানদের যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়া যেতে পারে। তবে মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) ও সাহেবাইন (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ)-এর মতে জায়েয। তাঁদের দুটি রেওয়ায়েতের মধ্যে প্রকাশ্য রেওয়ায়েতের দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয়।---(মাযহারী)

যেসব মনীষী মুক্তিপণ নিয়ে কিংবা না নিয়ে ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দান করেছেন, তাঁরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতানুসারে সূরা মুহাম্মদের আয়াতকে সূরা আন্‌ফালের আয়াতের জন্য রহিতকারী এবং আন্‌ফালের আয়াতকে রহিত বলে সাব্যস্ত করেছেন। হানাফী ফিকাহ্‌বিদরা সূরা মুহাম্মদের আয়াতকে রহিত এবং সূরা আন্‌ফালের اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ এবং فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ আয়াত-দ্বয়কে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই মুক্তিপণের বিনিময়েই হোক وَجَدْتُّمُوْهُمْ আর বিনিময় ছাড়াই হোক, বন্দীদের ছেড়ে দেয়া তাদের নিকট জায়েয নয়।-(মাযহারী)

কিন্তু যদি সূরা আন্‌ফাল ও সূরা মুহাম্মদের আয়াতের শব্দাবলীর প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয়, এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিই কোনটির জন্য নাসেখ বা মনসূখ নয়; বরং এ দুটিই দুটি বিভিন্ন অবস্থার হুকুম।

সূরা আন্‌ফালের আয়াতেও মূল হুকুম اِثْخَانٌ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ হত্যার মাধ্যমে কাফিরদের শক্তি-সামর্থ্যকে ভেঙে দেয়ার এবং পরে সূরা মুহাম্মদের আয়াতে مَنٌّ ও فِدَاءٌ (অর্থাৎ বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে অথবা বিনিময় ব্যতিরেকে) ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে اِثْخَانٌ فِى الْاَرْضِ--এর বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ রক্তপাতের মাধ্যমে কাফিরদের শক্তি-সামর্থ্যকে পঙ্গু করে দেয়ার পর মুক্তিপণ নিয়ে বা না নিয়ে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার অধিকার রয়েছে।

'সিয়ারে কবীরে' হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-র রেওয়ায়েতেরও এমনি উদ্দেশ্য হতে পারে যে, মুসলমানদের অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে উভয় প্রকার নির্দেশই দেয়া যেতে পারে।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ
فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ
مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

(৭০) হে নবী তাদেরকে বলে দাও, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে যে, আল্লাহ্ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মঙ্গলচিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে।

তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৭১) আর যদি তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়—বস্তুত তারা আল্লাহ্র সাথেও ইতিপূর্বে প্রতারণা করেছে, অতপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত, সুকৌশলী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে রসূল, আপনার কব্জায় যেসব বন্দী রয়েছে (তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়ে গেছে) আপনি তাদের বলে দিন, তোমাদের মনে ঈমান রয়েছে বলে যখন আল্লাহ্ জানবেন (অর্থাৎ তোমরা সত্য সত্যই যখন মুসলমান হয়ে যাবে—কারণ, আল্লাহ্র জানা যে বাস্তবানুগই হয়ে থাকে এবং তিনি তাকেই মুসলমান বলে জানবেন, যে বাস্তবিকই মুসলমান হয়। পক্ষান্তরে যে অমুসলিম হবে, তাকে তিনি অমুসলিমই জানবেন। সুতরাং তোমরা যদি মনের দিক দিয়েও মুসলমান হয়ে গিয়ে থাক) তবে তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণস্বরূপ) যা কিছু নেয়া হয়েছে, তোমাদের (পার্থিব-জীবনে) তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দিয়ে দেবেন এবং (আখিরাতেও) তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। বস্তুত আল্লাহ্ একান্তই ক্ষমাশীল। (সে জন্যই তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আর) তিনি অত্যন্ত করুণাময়। (কাজেই তোমাদের তিনি প্রতিদানও দেবেন।) অথচ যদি তারা (সত্যিকারভাবে মুসলমান না হয়ে শুধু আপনাকে ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ করে এবং মনে মনে) আপনার সাথে প্রতারণার ইচ্ছা পোষণ করে, (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আপনার সাথে বিরোধিতা ও মুকাবিলা করতে চায়) তবে (সে জন্য আপনি আদৌ ভাববেন না) আল্লাহ পুনরায় তাদেরকে আপনার হাতে বন্দী করিয়ে দেবেন। যেমন (ইতিপূর্বে) তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল (এবং আপনার বিরোধিতা ও মুকাবিলা করেছিল) অতপর আল্লাহ্ তাদেরকে (আপনার হাতে) বন্দী করিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় ব্যাপারেই সক্ষম, পরিজ্ঞাত, (কে খেয়ানতকারী সে বিষয়ে তিনি ভালই জানেন। আর) একান্তই কুশলী। (তিনি এমন সব অবস্থা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যাতে খেয়ানতকারী তথা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীরা পরাজিত হতে বাধ্য হয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গযওয়ায়ে বদরের বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। ইসলাম ও মুসলমানদের সে শত্রু যারা তাদেরকে কষ্ট দিতে, মারতে এবং হত্যা করতে কখনই কোন ত্রুটি করেনি; যখনই কোন রকম সুযোগ পেয়েছে একান্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসার পর এহেন শত্রুদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়াটা সাধারণ ব্যাপার ছিল না; এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি এবং অসাধারণ দয়া ও করুণা। পক্ষান্তরে মুক্তিপণ হিসাবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও ছিল অতি সাধারণ।

এটা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত মেহেরবানী ও দয়া যে, এই সাধারণ অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে যে কষ্ট তাদের করতে হয়, তাও তিনি কি চমৎকারভাবে দূর করে দিয়েছেন। উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদের মন-মানসিকতায় কোন রকম কল্যাণ দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাদের দিয়ে দেবেন। তদুপরি তোমাদের অতীত পাপও তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এখানে خَيْر অর্থ ঈমান ও নিষ্ঠা। অর্থাৎ মুক্তি লাভের পর সেসব বন্দীদের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা যে মুক্তিপণ দিয়েছে, তার চাইতে অধিক ও উত্তম বস্তু পেয়ে যাবে। বন্দী-দের মুক্ত করে দেয়ার সাথে সাথে তাদের এমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, তারা যেন মুক্তিলাভের পর নিজেদের লাভ-ক্ষতির প্রতি মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। সুতরাং বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান ছাড়াও পার্থিব জীবনে এত অধিক পরিমাণ ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, যা তাদের দেয়া মুক্তিপণ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও অধিক ছিল।

অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ আয়াতটি মহানবী (সা)-র পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ তিনিও বদরের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেও মুক্তিপণ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফির সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে প্রায় 'সাতশ' স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান।

যখন মুক্তিপণ দেয়ার সময় আসে, তখন তিনি হুযুর আকরাম (সা)-এর নিকট নিবেদন করলেন, আমার কাছে যে স্বর্ণ ছিল সেগুলোকেই আমার মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হোক। হুযুর (সা) বললেন, যে সম্পদ আপনি কুফরীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তা তো মুসলমানদের গনীমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, ফিদ্ইয়া বা মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। সাথে সাথে তিনি এ কথাও বললেন যে, আপনার দুই ভাতিজা 'আকীল ইবনে-আবী তালেব এবং নওফল ইবনে হারেসের মুক্তিপণও আপনাকেই পরিশোধ করতে হবে। আব্বাস (রা) নিবেদন করলেন, আমার উপর যদি এত অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, তবে আমাকে কোরাইশদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে; আমি সম্পূর্ণভাবে ফকির হয়ে যাব। মহানবী (সা) বললেন, কেন, আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট রেখে এসেছেন? হযরত আব্বাস (রা) বললেন, আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন? আমি যে রাতের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট অর্পণ করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোন লোকই অবগত নয়। হুযুর (সা) বললেন, সে ব্যাপারে আমার পরওয়ারদিগার আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন। একথা শুনেই হযরত আব্বাস (রা)-এর মনে হুযুর (সা)-এর

নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া এর আগেও তিনি মনে মনে হুযূর (সা)-এর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু কিছু সন্দেহও ছিল যা এসময় আল্লাহ্ তা'আলা দূর করে দেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তখনই মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তাঁর বহু টাকা-কড়ি মক্কার কুরাইশদের নিকট ঋণ হিসাবে প্রাপ্য ছিল। তিনি যদি তখনই তাঁর মুসলমান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন, তবে সে টাকাগুলো মারা যেত। কাজেই তিনি তখনই তা ঘোষণা করলেন না। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও এ ব্যাপারে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করলেন না। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি মহানবী (সা)-র নিকট মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে মহানবী (সা) তাঁকে এ পরামর্শই দিলেন, যাতে তিনি এ মুহূর্তে হিজরত না করেন।

হযরত আব্বাস (রা)-এর এ সমস্ত কথোপকথনের প্রেক্ষিতে রসূলে করীম (সা) উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত খোদায়ী ওয়াদার বিষয়টিও তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি যদি মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকেন এবং একান্ত নিষ্ঠাসহকারে ঈমান এনে থাকেন, তবে যেসব মালামাল আপনি মুক্তিপণ বাবদ খরচ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন। সুতরাং হযরত আব্বাস (রা) ইসলাম প্রকাশের পর প্রায়ই বলে থাকতেন, আমি তো সে ওয়াদার বিকাশ ও বাস্তবতা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছি। কারণ, আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ বাবদ বিশ উকিয়া সোনা নেয়া হয়েছিল। অথচ এখন আমার বিশটি গোলাম (ক্রীতদাস) বিভিন্ন স্থানে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের কারো ব্যবসায়ই বিশ হাজার দিরহাম থেকে কম নয়। তদুপরি হজ্জের সময় হাজীদের পানি খাওয়ানোর খিদমতটিও আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে যা আমার নিকট এমন এক অমূল্য বিষয় যে, সমগ্র মক্কাবাসীর যাবতীয় ধন-সম্পদও এ তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হয়।

গযওয়ায়ে বদরের বন্দীদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সম্পর্কে লোকদের মনে একটা খট্‌কা ছিল যে, হয়তো এরা মক্কায় ফিরে গিয়ে আবার ইসলাম থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং পরে আমাদের কোন-না-কোন ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হবে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এ খট্‌কাটি এভাবে দূর করে দিয়েছেন:

إِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ

فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -

অর্থাৎ যদি আপনার সাথে খেয়ানত করার সংকল্পই তারা করে, তবে তাতে আপনার কোন ক্ষতিই সাধিত হবে না। এরা তো সেসব লোকই, যারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র সাথেও খেয়ানত করেছে। অর্থাৎ সৃষ্টিলগ্নে আল্লাহ্ তা'আলা রব্বুল আলামীন তথা বিশ্বপালক হওয়ার ব্যাপারে যে অঙ্গীকার তারা করেছিল, পরবর্তীকালে তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তাদের এই খেয়ানত তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত

হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা অপদস্থ, পদদলিত, লাঞ্ছিত ও বন্দী হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা মনের গোপনতম রহস্য সম্পর্কেও অবহিত রয়েছেন। তিনি বড়ই সুকৌশলী, হিকমতওয়ালা। এখনও যদি তারা আপনার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ্র হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে যাবে কোথায়? তিনি এমনিভাবে তাদেরকে পুনরায় গ্রেফতার করে ফেলবেন। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের একান্ত উৎসাহ-ব্যঞ্জক ভঙ্গিতে ইসলামের প্রতি আহবান করা হয়েছিল। আর আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের পার্থিব ও পারত্রিক কল্যাণ শুধুমাত্র ইসলাম ও ঈমানের উপরই নির্ভরশীল।

এ পর্যন্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাদের বন্দীদশা ও মুক্তি দান এবং তাদের সাথে সন্ধি-সমঝোতার বিধান সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। পরবর্তী আয়াতসমূহে অর্থাৎ সূরার শেষ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গেই এক বিশেষ অধ্যায়ের আলোচনা ও তার বিধি-বিধান সংক্রান্ত কিছু বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে হিজরত সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম। কারণ কাফিরদের সাথে মুকাবিলা করতে গিয়ে এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যে, মুসলমানদের হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না এবং তারাও সন্ধি করতে রাযী হবে না। এহেন নাযুক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ হল হিজরত। অর্থাৎ এ নগরী বা দেশ ছেড়ে অন্য কোন নগরী বা জনপদে গিয়ে বসতি স্থাপন করা যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামী হুকুম-আহ্কামের উপর আমল করা যাবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّن
وَّلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ
فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۗ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ

أَوَوْا وَّنَصَرُوْٓا أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ
كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَأُولٰٓئِكَ
مِنْكُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾

(৭২) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য-সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী-চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মুকাবিলায় নয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ সে সবই দেখেন। (৭৩) আর যারা কাফির তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। (৭৪) আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তারাই হলো সত্যিকার মুসলমান। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী (৭৫) আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত যারা আত্মীয়, আল্লাহ্‌র বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছেন, হিজরত করেছেন এবং নিজেদের জান মালের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদও করেছেন (স্বভাবতই যা হিজরতের পর সংঘটিত হওয়া অনিবার্য ছিল। যদিও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধি এর উপর নির্ভরশীল নয়; এ দলকেই মুহাজিরীন নামে অভিহিত করা হয়।) আর যারা (এই মুহাজিরীনদের) আশ্রয় দিয়েছেন এবং (তাঁদের) সাহায্য-সহায়তা করেছেন, (যারা আনসার নামে অভিহিত, এতদুভয় প্রকার লোকেরা) পারস্পরিক উত্তরাধিকারী হবেন। (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান এনেছেন কিন্তু হিজরত করেননি, তাঁদের সাথে তোমাদের (অর্থাৎ মুহাজিরীনদের) মীরাসের কোন সম্পর্ক নেই (না এরা তাদের উত্তরাধিকারী, আর না তারা এদের উত্তরাধিকারী হবে——) যতক্ষণ না তারা হিজরত করবেন। (বস্তুত যখন হিজরত করে চলে আসবে,

তখন তাঁরাও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।) আর (তাদের সাথে তোমাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্ক না থাকলেও) যদি তারা তোমাদের নিকট ধর্মীয় কাজে (অর্থাৎ কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে) সাহায্য কামনা করে, তবে তোমাদের জন্য তাদের সাহায্য করা ওয়াজিব। তবে সেসব জাতি-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে (তা ওয়াজিব) নয়, যাদের সাথে তোমাদের (সন্ধি) চুক্তি থাকবে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (সুতরাং তাঁর নির্ধারিত বিধি-বিধানের বিচ্যুতি ঘটিয়ে অসন্তুষ্টির যোগ্য হতে যেয়ো না) আর (তোমাদের মধ্যে যেমন পারস্পরিক উত্তরাধিকারের সম্পর্ক রয়েছে; তেমনিভাবে) যারা কাফির তারাও পারস্পরিক উত্তরাধিকারী। (না তারা তোমাদের উত্তরাধিকারী, আর না তোমরা তাদের উত্তরাধিকারী।) যদি (আলোচ্য) এই নির্দেশের উপর তোমরা আমল না কর, (বরং অসীম ধর্মীয় বিরোধ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আত্মীয়তার কারণে মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্পর্ক বিদ্যমান রাখ) তবে দুনিয়া জুড়ে মহা ফাসাদ (ও বিপর্যয়) বিস্তার লাভ করবে। (তার কারণ, পারস্পরিক উত্তরাধিকারের দরুন সবাইকে একই দলভুক্ত বিবেচনা করা হবে। অথচ পৃথক দলগত ঐক্য ছাড়া ইসলামের পরিপূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য লাভ হতে পারে না। পক্ষান্তরে ইসলামের দুর্বলতাই হল বিশ্বময় যাবতীয় ফিতনা-ফাসাদের মূল।) আর [মুহাজিরীন ও আনসারদের পারস্পরিক উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশে সে সমস্ত মুহাজিরীনই অন্তর্ভুক্ত, যারা হুযূরে আকরাম (সা)-এর সময়ে হিজরত করেছেন অথবা পরবর্তীতে। অবশ্য তাঁদের মর্যাদায় পার্থক্য থাকবে।] যারা (প্রাথমিক পর্যায়ে) মুসলমান হয়েছেন এবং [নবী করীম (সা)-এর সময়েই] হিজরত করেছেন এবং (প্রথম থেকেই) আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করেছেন আর যারা (সে সমস্ত মুহাজিরীনকে) নিজেদের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন এবং সাহায্য-সহায়তা করেছেন, তারা সবাই ঈমানের পূর্ণ হক আদায়কারী। (কারণ, ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে অগ্রবর্তী থাকাটাই হলো তার হক।) তাদের জন্য (আখিরাতে) বিরাট মাগফিরাত এবং (জান্নাতে) বিপুল সম্মানজনক রুযী (নির্ধারিত) রয়েছে। বস্তুত যারা [নবী করীম (সা)-এর হিজরতের] পরবর্তীকালে ঈমান গ্রহণ করেছে এবং হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে (অর্থাৎ করণীয় সবকিছুই করেছে, কিন্তু পরে করেছে) তারা (ফযীলত ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে তোমাদের সমপর্যায়ের না হলেও) তোমাদের মধ্যেই গণ্য হবে। (তা ফযীলত ও মর্যাদার ক্ষেত্রে আপেক্ষিকভাবে কম বেশি হবে। কারণ, আমলের পার্থক্যের দরুন মর্যাদার পার্থক্য ঘটে। অবশ্যই মীরাসের ক্ষেত্রে তারা সব দিক দিয়েই তোমাদের মাঝে গণ্য হবে। তার কারণ, আমলজনিত মর্যাদার দরুন শরীয়তের বিধিবিধানের কোন পার্থক্য ঘটে না। আর পরবর্তীকালে হিজরতকারীদের মধ্যে) যারা (পারস্পরিক অথবা পূর্ববর্তী মুহাজিরীনদের) আত্মীয় (মর্যাদার দিক দিয়ে কম হওয়া সত্ত্বেও তারা উত্তরাধিকার লাভের দিক দিয়ে) কিতাবুল্লাহ্ (তথা শরীয়তের বিধান কিংবা মীরাস সংক্রান্ত আয়াত-এর ভিত্তিতে একে অপরের উত্তরাধিকারের তুলনায়) বেশি হকদার। (আত্মীয়রা মর্যাদার দিক দিয়ে অধিক হলেও।) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাবতীয়

বিষয়ে সম্যক অবগত। (সে কারণেই তিনি যে বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছেন, তা সর্বকালীন কল্যাণের ভিত্তিতেই করেছেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতগুলো সূরা আন্‌ফালের শেষ চারিটি আয়াত। এগুলোতে সে সমস্ত আহকাম বর্ণনাই প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য যা মুসলমান মুহাজিরদের উত্তরাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে অমুহাজির মুসলমান ও অমুসলমানদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলোচনাও এসে গেছে।

এসব বিধি-বিধান বা হুকুম-আহকামের সারমর্ম এই যে, যে সমস্ত লোকের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান বর্তায় তারা প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত ; মুসলমান ও কাফির। আবার মুসলমান তখনকার দৃষ্টিতে দু'রকম; (১) মুহাজির; যারা হিজরত ফরয হওয়ার প্রেক্ষিতে মক্কা থেকে মদীনায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। (২) যারা কোন বৈধ অসুবিধার দরুন কিংবা অন্য কোন কারণে মক্কাতেই থেকে যান।

পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক এ সবরকম লোকের মাঝেই বিদ্যমান ছিল। কারণ, ইসলামের প্রাথমিক পর্বে এমন হয়েছিল যে, পুত্র হয়তো মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পিতা কাফিরই রয়ে গেল। কিংবা পিতা মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পুত্র রয়ে গেল কাফির। তেমনিভাবে ভাই-ভাতিজা, নানা-মামা প্রভৃতির অবস্থাও ছিল তাই। তদুপরি মুহাজির-অমুহাজির মুসলমানদের মধ্যে আত্মীয়তা থাকা তো বলাই বাহুল্য।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম রহমত ও পরম কুশলতার দরুন মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত মাল-আসবাব তথা ধন-সম্পদের অধিকারী তারই নিকটবর্তী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ যে যা কিছু এ পৃথিবীতে অর্জন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত কিছুর মালিকানাই আল্লাহ্ তা'আলার। তাঁর পক্ষ থেকে এগুলো সারা জীবন ব্যবহার করার জন্য, এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য মানুষকে অস্থায়ী মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারে চলে যাওয়াটাই ছিল ন্যায়বিচার ও যুক্তিসম্মত। যার কার্যকর রূপ ছিল ইসলামী বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারে জমা হয়ে যাওয়ার পর তদ্দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালন ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এমনটি করতে গেলে একদিকে মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অনুভূতি আহত হত। তাছাড়া মানুষ যখন একথা জানত যে, মৃত্যুর পর আমার ধন-সম্পদ না পাবে আমার সন্তানসন্ততি, না পাবে আমার পিতামাতা, আর না পাবে আমার স্ত্রী, তখন তার ফল দাঁড়াত এই যে, স্বভাবসিদ্ধভাবে কোন মানুষই স্বীয় মালামাল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করত না। শুধুমাত্র নিজের জীবন পর্যন্তই প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করত। তার বেশি কিছু করার জন্য কেউ এতটুকু যত্নবান হত না। বলা বাহুল্য, এতে সমগ্র মানবজাতি ও সমস্ত শহর-নগরীর উপর ধ্বংস ও বরবাদী নেমে আসত।

সে কারণেই আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে তার আত্মীয়-স্বজনের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। বিশেষ করে এমন আত্মীয়-স্বজনের উপকারিতার লক্ষ্যে সে তার জীবনে ধন-সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করত এবং নানা রকম কষ্ট পরিশ্রমে ব্রতী হত।

এরই সাথে সাথে ইসলাম যে অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটির প্রতিও মীরাসের বণ্টন ব্যাপারে লক্ষ্য রেখেছে, যার জন্য গোটা মানব জাতির সৃষ্টি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদত। এদিক দিয়ে সমগ্র মানব বিশ্বকে দু'টি পৃথক পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে; মুমিন ও কাফির। কোরআনে উল্লেখিত এ আয়াত خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ -এর মর্মও তাই।

এই দ্বি-বিধ জাতীয়তার দর্শনই বংশ ও গোত্রগত সম্পর্ককে মীরাসের পর্যায় পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং কোন মুসলমান কোন কাফির আত্মীয়ের মীরাসের কোন অংশ পাবে না এবং কোন কাফিরেরও তার কোন মুসলমান আত্মীয়ের মীরাসে কোন অধিকার থাকবে না। প্রথমোক্ত দু'টি আয়াতে এ বিষয়েরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বস্তুত এ নির্দেশটি চিরস্থায়ী ও অরহিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের এ উত্তরাধিকার নীতিই বলবৎ থাকবে।

এর সাথে মুসলমান মুহাজির ও আনসারদের মীরাস সংক্রান্ত অন্য একটি হুকুম রয়েছে, যার সম্পর্কে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানরা যতক্ষণ মক্কা থেকে হিজরত না করবে, হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে তাদের উত্তরাধিকারসংক্রান্ত সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন থাকবে। না কোন মুহাজির মুসলমান তার অমুহাজির মুসলমান আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী হবে, না অমুহাজির কোন মুসলমান মুহাজির মুসলমানের মীরাসের কোন অংশ পাবে। বলা বাহুল্য, এ নির্দেশটি তখন পর্যন্তই কার্যকর ছিল যতক্ষণ না মক্কা বিজয় হয়ে যায়। কারণ, মক্কা বিজয়ের পর স্বয়ং রসূলে করীম (সা) ঘোষণা করে দেন, لا هجرة بعد الفتح অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের হুকুমটিই শেষ হয়ে গেছে। আর হিজরতের হুকুমই যখন শেষ হয়ে গেল, তখন যারা হিজরত করবে না, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্নটিও শেষ হয়ে যায়।

এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন, এ হুকুমটি মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে অনুসন্ধানবিদদের মতে এ হুকুমটিও চিরস্থায়ী ও গায়ের মনসূখ, কিন্তু এটি অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যে পরিস্থিতিতে কোরআনের অবতরণকালে এ হুকুমটি নাযিল হয়েছিল, যদি কোন কালে কোন দেশে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে সেখানেও এ হুকুমই প্রবর্তিত হবে।

বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর হিজরত করা 'ফরযে আইন' তথা অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে হাতেগনা কতিপয় মুসলমান ছাড়া বাকি সব মুসলমানই হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। তখন মক্কা থেকে হিজরত না করা এরই লক্ষণ হয়ে গিয়েছিল যে, সে মুসলমান নয়। কাজেই অমুহাজিরদের ইসলামও তখন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেজন্যই মুহাজির অমুহাজিরদের উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল।

এখন যদি কোন দেশে আবারও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেখানে বসবাস করে যদি ইসলামী ফরায়েয সম্পাদন করা আদৌ সম্ভব না হয়, তবে সে দেশ থেকে হিজরত করা পুনরায় ফরয হয়ে যাবে। আর এমন পরিস্থিতিতে অতি জটিল কোন ওযর ব্যতীত হিজরত না করা নিশ্চিতভাবে যদি কুফরীর লক্ষণ বলে গণ্য হয়, তবে আবারও এ হুকুমই আরোপিত হবে। মুহাজির ও অমুহাজিরের মাঝে পারস্পরিক উত্তরাধিকার স্বত্ব বজায় থাকবে না। এ বর্ণনাতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাজির ও অমুহাজিরদের মাঝে মীরাসী স্বত্ব রহিত করণের হুকুমটি প্রকৃতপক্ষে পৃথক কোন হুকুম নয়, বরং এটিও সে প্রাথমিক নির্দেশ, যা মুসলমান ও অমুসলমানের মাঝে উত্তরাধিকার স্বত্বকে ছিন্ন করে দেয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এই কুফরীর লক্ষণের প্রেক্ষিতে তাকে কাফির বলে সাব্যস্ত করা হয়নি, যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রকৃষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে কুফরীর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আর হয়তো এ যুক্তিতেই এখানে আরেকটি নির্দেশ অমুহাজির মুসলমানদের কথা উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা মুহাজির মুসলমানদের নিকট কোন রকম সাহায্য-সহায়তা কামনা করে, তবে মুহাজির মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্য করা কর্তব্য; যাতে এ কথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, অমুহাজির মুসলমানদের সম্পূর্ণভাবে কাফিরদের কাতারে গণ্য করা হয়নি, বরং তাদের এই ইসলামী অধিকার এখনও বলবৎ রয়ে গেছে যে, সাহায্য কামনা করলে তারা সাহায্য পেতে পারে।

আর যেহেতু এ আয়াতের শানে-নুযুল মক্কা থেকে মদীনায় বিশেষ হিজরতের সাথে যুক্ত এবং তারাই অমুহাজির মুসলমান ছিলেন, যারা মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং কাফিরদের উৎপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, কাজেই তাঁদের সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি যে একান্তই মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে ছিল, তা বলাই বাহুল্য। আর কোরআন করীম যখন মুহাজির মুসলমানদের প্রতি তাদের (অমুহাজির মক্কাবাসী মুসলমানদের) সাহায্যের নির্দেশ দান করেছে, তাতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একথাই বোঝা যায় যে, যে কোন অবস্থায়, যে কোন জাতির মুকাবিলায় তাঁদের সাহায্য করা মুসলমানদের উপর অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। এমনকি যে জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা হবে তাদের সাথে যদি মুসলমানদের কোন যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েও থাকে তবুও তাই করতে হবে, অথচ ইসলামী নীতিতে ন্যায়নীতি ও চুক্তির অনুবর্তিতা একটি অতি গুরুত্ব-

পূর্ণ ফরয। সে কারণেই এ আয়াতে একটি ব্যতিক্রমী নির্দেশেরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুহাজির মুসলমান যদি মুহাজির মুসলমানের নিকট এমন কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছে, তবে চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের মুকাবিলায় নিজেদের মুসলমান ভাইদের সাহায্য করাও জায়েয নয়।

এই ছিল প্রথম দু'টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এবার বাক্যের সাথে তুলনা করে দেখা যাক। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ○

অর্থাৎ সেসমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি ও আত্মীয়-আপনজনদের পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাহে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে, সম্পদ ব্যয় করে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছে; অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরবৃন্দ এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে; অর্থাৎ মদীনার আনসার মুসলমানগণ---এতদুভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পরস্পরের ওলী সহায়ক। অতপর বলা হয়েছে, সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে বটে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের কোনই সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে।

এখানে কোরআন করীম وَلَايَتٌ ও وَلِيٌّ শব্দ ব্যবহার করেছে, যার প্রকৃত অর্থ হল বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত হাসান কাতাদাহ ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের মতে এখানে ولايت অর্থ উত্তরাধিকার এবং ولى অর্থ উত্তরাধিকারী। আর কেউ কেউ এখানে এর আভিধানিক অর্থ বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহায়তাও নিয়েছেন।

প্রথম তফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম এই যে, মুসলমান মুহাজির ও আনসার পারস্পরিকভাবে একে অপরের ওয়ারিস হবেন। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক না থাকবে অমুসলমানদের সাথে আর না থাকবে সে সমস্ত মুসলমানের সাথে যারা

হিজরত করেন নি। প্রথম নির্দেশ অর্থাৎ দ্বীনী পার্থক্য তথা ধর্মীয় বৈপরীত্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের ছিন্নতার বিষয়টি তো চিরস্থায়ী আছেই, বাকি থাকল দ্বিতীয় হুকুমটি। মক্কা বিজয়ের পর যখন হিজরতেরই প্রয়োজন থাকেনি, তখন মুহাজির ও অমুহাজির-দের উত্তরাধিকারের বিচ্ছিন্নতার হুকুমটিও আর বলবৎ থাকেনি। এর দ্বারা কোন কোন ফিকাহবিদ প্রমাণ করেছেন যে, দ্বীনের পার্থক্য যেমন উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ, তেমনিভাবে দেশের পার্থক্যও উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ বিষয়টির বিস্তা-রিত আলোচনা ফিকাহ্‌র কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

অতপর ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থাৎ এসব লোক হিজরত করেনি যদিও তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু যে কোন অবস্থায় তারাও মুসলমান। যদি তারা নিজেদের দ্বীনের হিফাযতের জন্য মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে তাঁদের সাহায্য করা তাঁদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলে ন্যায় ও ইনসাফের অনুবর্তিতার নীতিকে বিসর্জন দেয়া যাবে না। তারা যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তবে সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সেসব মুসলমানের সাহায্য করা জায়েয নয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। রসূলে করীম (সা) যখন মক্কার কাফিরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং চুক্তির শর্তে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এখন মক্কা থেকে যে ব্যক্তি মদীনায় চলে যাবে হুযুর (সা) তাকে ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক এই সন্ধি চুক্তিকালেই আবূ জান্দাল (রা) যাকে কাফিররা মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল এবং নানাভাবে নির্যাতন করছিল, কোন রকমে মহানবীর খিদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং নিজের উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশ করে রসূলুল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যে নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে আগমন করেছিলেন, একজন নিপীড়িত মুসলমানের ফরিয়াদ শুনে তিনি কি পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন, তার অনু-মান করাও যার তার জন্য সম্ভব নয়, কিন্তু এহেন মর্মপীড়া সত্ত্বেও উল্লেখিত আয়াতের হুকুম অনুসারে তিনি তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে অপারকতা জানিয়ে ফিরিয়ে দেন।

তাঁর এভাবে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি সমস্ত মুসলমানের জন্যই একান্ত পীড়াদায়ক ছিল, কিন্তু সরওয়ারে কায়েনাত (সা) আল্লাহ্‌র নির্দেশের আলোকে যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন যে, এখন আর এ নির্যাতন-নিপীড়নের আয়ু বেশি দিন নেই। তাছাড়া আর কটি দিন

ধৈর্য ধারণের সওয়াবও আবূ জান্দালের প্রাপ্য রয়েছে। এর পরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এসব কাহিনীর সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। যাহোক, তখন মহানবী (সা) কোরআনী নির্দেশ মুতাবেক চুক্তির অনুবর্তিতাকেই তাঁর ব্যক্তিগত বিপদাপদের উপর গুরুত্ব দান করেছিলেন। এটাই হল ইসলামী শরীয়তের সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার ফলে তাঁরা পার্থিব জীবনে বিজয় ও সম্মান এবং আখিরাতের কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হতে পেরেছেন। অন্যথায় সাধারণভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সরকারসমূহ চুক্তির নামে এক ধরনের প্রহসনের অবতারণা করে থাকে, যাতে দুর্বলকে দাবিয়ে রাখা এবং সবলকে ফাঁকি দেয়াই থাকে উদ্দেশ্য। যখন নিজেদের সামান্যতম স্বার্থ দেখতে পায়, তখনই নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে দেয়া হয় এবং দোষ অন্যের উপর চাপানোর ফন্দি-ফিকির করতে থাকে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ—وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

অর্থাৎ কাফিররা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। وَلِىٌّ শব্দটি যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। এতে যেমন ওরাসত বা উত্তরাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে অন্তর্ভুক্ত বৈষয়িক সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ও। কাজেই এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফিরদেরকে পারস্পরিক উত্তরাধিকারী মনে করতে হবে এবং উত্তরাধিকার বন্টনের যে আইন তাদের নিজেদের ধর্মে প্রচলিত রয়েছে, তাদের উত্তরাধিকারের বেলায় সে আইনই প্রয়োগ করা হবে। তদুপরি তাদের এতীম-অনাথ শিশুদের ওলী এবং বিবাহ-শাদীর অভিভাবক তাদেরই মধ্য থেকে নির্ধারিত হবে। সারকথা, সামাজিক বিষয়াদিতে অমুসলমানদের নিজস্ব আইন-কানুন ইসলামী রাষ্ট্রেও সংরক্ষিত রাখা হবে।

আয়াতের শেষভাগে ইরশাদ হয়েছেঃ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ অর্থাৎ তোমরা যদি এমনটি না কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে।

এ বাক্যটি সে সমস্ত হুকুম-আহকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, মুহাজির ও আনসারদের একে অপরের অভিভাবক হতে হবে---যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তা এবং ওরাসাত তথা উত্তরাধিকারের বিষয়-গুলো অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত এখানকার মুহাজিরীন ও অমুহাজিরীন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সাহায্য-সহায়তার সম্পর্ক তার শর্ত মুতাবেক বলবৎ থাকা উচিত। তৃতীয়ত, কাফিররা একে অন্যের ওলী

বিধায় পারস্পরিক অভিভাবকত্ব ও তাদের উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয়।

বস্তুত এ সমস্ত নির্দেশের উপর যদি আমল করা না হয়, তাহলে পৃথিবীতে গোল-যোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। সম্ভবত এ ধরনের সতর্কতা এ কারণে উচ্চারিত হয়েছে যে, এখানে যেসব হুকুম-আহকাম বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ন্যায়, সুবিচার ও সাধারণ শান্তি-শৃংখলার মূলনীতি স্বরূপ। কারণ, এসব আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্ক যেমন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও মতাদর্শগত সম্পর্কও বংশগত সম্পর্কের চেয়ে অগ্রবর্তী। সেজন্যই বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে পিতা-পুত্র কিংবা ভাই-ভাই হওয়া সত্ত্বেও কোন কাফির কোন মুসলমানের এবং কোন মুসলমান কোন কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরই সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্র-দায়িকতা ও মূর্খতা জনিত বিদ্বেষের প্রতিরোধকল্পে এই হিদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, ধর্মীয় সম্পর্ক এহেন সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির অনুবর্তিতা তার চেয়েও বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনাবশে সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয নয়। এমনিভাবে এই হিদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, কাফিররা একে অপরের উত্তরাধিকারী ও অভিভাবক। তাদের ব্যক্তিগত অধিকার ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যেন কোন রকম হস্তক্ষেপ করা না হয়। দৃশ্যত এগুলোকে কতিপয় আনুষঙ্গিক ও শাখাগত বিধান বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশান্তির জন্য এগুলোই ন্যায় ও সুবিচারের সর্বোত্তম ও ব্যাপক মূলনীতি। আর সে কারণেই এখানে এসব আহকাম তথা বিধিবিধান বর্ণনার পর এমন কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যা সাধারণত অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রে করা হয়নি। তা হল এই যে, তোমরা যদি এসব আহকামের উপর আমল না কর, তবে বিশ্বময় বিশৃংখলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে। বাক্যটিতে এ ইঙ্গিতও বিদ্যমান যে, দাঙ্গা বিশৃংখলা রোধে এসব বিধিবিধানের বিশেষ প্রভাব ও অবদান রয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের সাহায্যকারী মদীনাবাসী আনসারদের প্রশংসা, তাঁদের সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য ও তাঁদের মাগফিরাত ও সম্মানজনক উপার্জন দানের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا অর্থাৎ তারাই হচ্ছেন সত্যিকারভাবে মুসলমান। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হিজরত করতে পারেননি যদিও তাঁরা মুসলমান, কিন্তু তাদের ইসলাম পরিপূর্ণ নয় এবং নিশ্চিতও নয়। কারণ, তাতে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়তো বা তারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাবি করছে। তারপরেই বলা হয়েছেঃ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ অর্থাৎ তাঁদের জন্য মাগফিরাত নির্ধারিত। যেমন, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে

যে, الاسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها-

অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়।

চতুর্থ আয়াতে মুহাজিরদের বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজির, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পূর্বে হিজরত করেছেন এবং কেউ কেউ রয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের মুহাজির, যাঁরা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে হিজরত করেছেন। এর ফলে তাঁদের পরকালীন মর্যাদায় পার্থক্য হলেও পার্থিব বিধান মতে তাঁদের অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদেরই অনুরূপ। তাঁরা সবাই পরস্পরের ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী হবেন। সুতরাং মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মুহাজিররাও তোমাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত। সে কারণেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতেও তাদের হুকুম সাধারণ মুহাজিরদেরই মত।

এটি সূরা আনফালের সর্বশেষ আয়াত। এর শেষাংশে উত্তরাধিকার আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে সেই সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে, যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের মুহাজির ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃ বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। বলা হয়েছে ঃ

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

আরবী অভিধানে اولو শব্দটি 'সাথী' অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার বাংলা অর্থ হল 'সম্পন্ন'। যেমন اولوالعقل বুদ্ধিসম্পন্ন। اولوالامر দায়িত্বসম্পন্ন। কাজেই اولوالارحام অর্থ হয় গর্ভ-সাথী, একই গর্ভসম্পন্ন ارحام শব্দটি رحم শব্দের বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ হল সে অঙ্গ যাতে সন্তানের জন্মক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক গর্ভের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কাজেই اولوالارحام আত্মীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বস্তুত আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদিও পারস্পরিকভাবে একে অপরের উপর প্রত্যেক মুসলমানই একটি সাধারণ অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একের প্রতি অন্যের সাহায্য করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায় এবং একে অন্যের উত্তরাধিকারীও হয় কিন্তু যেসব মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিদ্যমান, তারা অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অগ্রবর্তী। এখানে فِي كِتَابِ اللَّهِ

অর্থ فِيْ حُكْمِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ নির্দেশবলে এ বিধান জারি হয়েছে।

এ আয়াত এই মূলনীতি বাতলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার মান অনুসারে বন্টন করা কর্তব্য। আর اُولُوا الْاَرْحَامْ সাধারণভাবে সমস্ত আত্মীয়-এগানা অর্থেই বলা হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কোরআন করীম সূরা নিসায় নির্ধারিত করে দিয়েছে। মীরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় 'আহলে ফারায়েয' বা 'যাবিল ফুরূয'। এদেরকে দেয়ার পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত হবে তা আয়াত দৃষ্টে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করা কর্তব্য। তাছাড়া এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে কোন সম্পত্তি বন্টন করে দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ দূরবর্তী আত্মীয়তা যে সমগ্র বিশ্বমানুষের মাঝেই বর্তমান, তাতে কোন রকম সন্দেহ-সংশয়েরই অবকাশ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ একই পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার বংশধর। কাজেই নিকটবর্তী আত্মীয়দের দূরবর্তীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করাই আত্মীয়দের মধ্যে মীরাস বন্টনের কার্যকর ও বাস্তব রূপ হতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ রসূলে করীম (সা)-এর হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'যাবিল ফুরূযে'র অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির 'আসাবাগণ' অর্থাৎ পিতামহ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে দেওয়া হবে। অর্থাৎ নিকটবর্তী আসাবাকে দূরবর্তী আসাবা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আসাবার বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা হবে। আর 'আসাবা'-র মধ্যে আর কেউ জীবিত না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে বন্টন করা হবে।

আসাবা ছাড়াও অন্য যেসব লোক আত্মীয় হতে পারে, ফরায়েয শাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের বোঝাবার জন্য 'যাবিল আরহাম' শব্দ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালে নির্ধারিত হয়েছে। কোরআন করীমে বর্ণিত اولوا الارحام শব্দটি কিন্তু আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। এতে যাবিল ফুরূয, আসাবা এবং যাবিল আরহাম সবাই মোটামুটি-ভাবে অন্তর্ভুক্ত।

তদুপরি এর কিছু বিস্তারিত বিশ্লেষণ সূরা নিসার বিভিন্ন আয়াতে দেয়া হয়েছে। তাতে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের প্রাপ্য অংশ আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদেরকে মীরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'যাবিল ফুরূয' বলা হয়। এছাড়া অন্যদের সম্পর্কে রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فهو لاولى رجل ذكر -

অর্থাৎ যাদের অংশ স্বয়ং কোরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদেরকেই দিতে হবে যারা মৃতের ঘনিষ্ঠতম পুরুষ।

এদেরকে মীরাসের পরিভাষায় 'আসাবা' (عصبا) বলা হয়। যদি কোন মৃত ব্যক্তির আসাবাদের কেউ বর্তমান না থাকে, রসূলে করীম (সা)-এর কথা অনুযায়ী তবেই মৃতের সম্পত্তির অংশ তাদেরকে দিতে হবে। এদেরকে বলা হয় 'যাবিল আরহাম'। যেমন মামা, খালা প্রভৃতি।

সূরা আনফালের শেষ আয়াতের সর্বশেষ বাক্যটির দ্বারা ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সে ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে মুহাজিরীন ও আনসারগণ আত্মীয়তার কোন বন্ধন না থাকলেও পরস্পরের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ হুকুমটি ছিল একটি সাময়িক হুকুম, যা হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে দেয়া ছিল।

সূরা আনফাল শেষ হল

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে তা উপলব্ধি করার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন!

تمت سورة الانفال بعون الله تعالى وحمده ليلة الخميس لثمانى وعشرين من جمادى الاخرى سنة ١٣٨١ هجرى - واسئل الله تعالى التوفيق والعون فى تكميل تفسير سورة التوبة ولله الحمد اوله واخره

محمد شفيع عفى عنه -

وتم النظر الثانى عليه يوم الجمعة لتسعة عشر من جمادى الاولى سنة ١٣٩٠ه والحمد لله على ذلك —

سورة التوبة

সূরা তওবা

মদীনায় অবতীর্ণ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ①
فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي
اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ② وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ
رَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ
وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ
غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ ③
اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا
وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ④ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ
وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا
الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑤

(১) সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ্ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। (২) অতপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে চার মাসকাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন। (৩) আর মহান হজ্বের

দিনে আল্লাহ্ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তার রসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফিরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্কে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফিরদের মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (৪) তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন। (৫) অতপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এখন থেকে) সম্পর্কছেদ করা হল আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে সেসব মুশরিকের সাথে যাদের সাথে তোমরা (মেয়াদ নির্দিষ্ট করা ব্যতীত) চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। (এ আদেশ তৃতীয় দলের জন্য, যাদের বিবরণ 'আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে দেয়া হবে। আর চতুর্থ দল, যাদের সাথে কোনরূপ চুক্তি হয়নি, তাদের কথা এ থেকেই ভাল বোঝা যায় যে, যখন চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উঠিয়ে নেয়া হল, তখন চুক্তি বহির্ভূত মুশরিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নই উঠে না।) অতএব (উক্ত দল দু'টিকে জানিয়ে দাও যে,) তোমরা পরিভ্রমণ কর এদেশে চার মাসকাল (যাতে এ অবসরে কোন সুযোগ বা আশ্রয়ের সন্ধান করে নিতে পার), আর (এতদসঙ্গে এ কথাও) জেনে রাখ (যে, এ অবকাশের ফলে তোমরা মুসলমানদের উৎপীড়ন থেকে রেহাই পেতে পারলেও,) তোমরা পরাভূত করতে পারবে না আল্লাহ্কে (যাতে তাঁর নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে পার), আর (একথাও জেনে রাখ যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্ (পরজীবনে) কাফিরদের লাঞ্ছিত করবেন (অর্থাৎ শাস্তি দেবেন। তোমাদের পরিভ্রমণ তার শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারবে না। এ ছাড়া দুনিয়াতে নিহত হওয়ার সম্ভাবনা তো আছেই। এতে রয়েছে তওবার উৎসাহ ও তাগিদ)। আর (প্রথম ও দ্বিতীয় দল সম্পর্কে) মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট করা ব্যতিরেকে এখনই সেই) মুশরিকদের (নিরাপত্তা বিধান) থেকে দায়িত্বমুক্ত (হচ্ছেন, যারা স্বয়ং চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এরা হল প্রথমোক্ত দল)। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও তাদের বলা যাচ্ছে যে,) যদি তোমরা (কুফরী থেকে) তওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্য (উভয় জগতে) কল্যাণকর হবে। (দুনিয়ার কল্যাণ হল এই যে, তোমাদের চুক্তি ভঙ্গের অপরাধ মার্জিত হবে এবং মুসলমানদের হাতে নিহত হবে না। আর আখিরাতের কল্যাণ হল, তথায় তোমাদের নাজাত হবে। আর যদি (ইসলাম থেকে)

মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্‌কে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না (যাতে কোথাও আত্মগোপন করে থাকতে পার)। আর (আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে না পারার ব্যাখ্যা হল, সেই) কাফিরদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও (যা নিশ্চিতভাবে আখিরাতে ভোগ করতে হবে। তবে দুনিয়াবী শাস্তির সম্ভাবনাও আছে। মোটকথা, ইসলাম বিমুখ হলে শাস্তি ভোগ অনিবার্য)। তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতপর যারা তোমাদের (সাথে কৃত চুক্তি পালনে) কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কোন (শত্রুকে) সাহায্যও করেনি (তারা হল দ্বিতীয় দল), তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া (নির্দিষ্ট) মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। (সাবধান! চুক্তি ভঙ্গ করো না। কারণ) অবশ্যই আল্লাহ্‌ (চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারে) সাবধানী লোকদের পছন্দ করেন। অতএব, তোমরাও সাবধানতা অবলম্বন কর; এতে আল্লাহ্‌ পাকের প্রিয়পাত্র হবে। সামনে প্রথম দলের অবশিষ্ট হুকুম বর্ণিত হচ্ছে যে, এদের যখন অবকাশ নেই তাই এদের হত্যা করার সুযোগ যদি এখনো থাকত, তথাপি মুহররম মাস শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করবে। (কারণ, নিষিদ্ধ মাসসমূহে রক্তপাত অবৈধ।) অতপর নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হলে হত্যা কর (প্রথম দলভুক্ত) মুশরিকদের যেখানে তাদের পাও এবং তাদের বন্দী কর ও অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসো। কিন্তু যদি (কুফর থেকে তারা) তওবা করে (নেয় এবং ইসলামের হুকুম তা'মীল করে—যেমন,) নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। (তাদের হত্যা ও বন্দী করো না। কারণ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (এজন্যে তিনি তওবাকারীদের কুফরী অপরাধ মার্জনা করেন এবং তাদের জানের নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহ্‌র এ হুকুম অবশিষ্ট দলের বেলায়ও প্রযোজ্য যখন তাদের মেয়াদ অতিক্রান্ত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখান থেকে সূরা বরাআতের শুরু। একে সূরা 'তওবাও' বলা হয়। বরাআত বলা হয় এ জন্য যে, এতে কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদ ও তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তির উল্লেখ রয়েছে। আর 'তওবা' বলা হয় এজন্য যে, এতে মুসলমানদের তওবা কবুল হওয়ার বর্ণনা রয়েছে—(মাযহারী)। সূরাটির একটি বৈশিষ্ট্য হল, কোরআন মজীদে এর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্‌' লেখা হয় না, অথচ অন্য সকল সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্‌ লেখা হয়। এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্‌ লিখিত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধানের আগে মনে রাখা আবশ্যক যে, কোরআন মজীদ তেইশ বছরের দীর্ঘ পরিসরে অল্প অল্প করে নাযিল হয়। এমনকি একই সূরার বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়। হযরত জিব্রীলে আমীন 'ওহী নিয়ে এলে আল্লাহ্‌র আদেশ মতে কোন্ সূরার কোন্ আয়াতের পর অত্র আয়াতকে স্থান দিতে হবে তাও বলে যেতেন। সেমতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) ওহী লেখকদের দ্বারা তা' লিখিয়ে নিতেন।

একটি সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সূরা শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' নাযিল হত। এর থেকে বোঝা যেত যে, একটি সূরা শেষ হল, অতপর অপর সূরা শুরু হল। কোরআন মজীদের সকল সূরার বেলায় এ নীতি বলবৎ থাকে। সূরা তওবা সর্বশেষে নাযিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম। কিন্তু সাধারণ নিয়ম মতে এর শুরুতে না বিসমিল্লাহ্ নাযিল হয় আর না রসূলুল্লাহ্ (সা) তা লিখে নেয়ার জন্য ওহী লেখকদের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় হযরত (সা)-এর ইন্তিকাল হয়।

কোরআন সংগ্রাহক হযরত উসমান গনী (রা) স্বীয় শাসনামলে যখন কোরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সূরার বরখেলাফ সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' নেই। তাই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোন সূরা নয় বরং অন্য কোন সূরার অংশ। এতে এ প্রশ্নের উদ্ভবও হয় যে, এমতাবস্থায় তা কোন্ সূরার অংশ হতে পারে? বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একে সূরা আন্‌ফালের অংশ বলাই সংগত।

হযরত উসমান (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা)-এর যুগে সূরা আনফাল ও তওবাকে করীনাতাইন বা মিলিত সূরা বলা হত (মাযহারী)। সেজন্য একে সূরা আন্‌ফালের পর স্থান দেয়া হয়। এতে এ সতর্কতাও অবলম্বিত হয়েছে যে, বাস্তবে যদি এটি সূরা আন্‌ফালের অংশ হয়, তবে তারই সাথে যুক্ত থাকাই দরকার। পক্ষান্তরে সূরা তওবার স্বতন্ত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। তাই কোরআন লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় সূরা আন্‌ফালের শেষে এবং সূরা তওবা শুরু করার আগে কিছু ফাঁক রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন, অপরাপর সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্'-র স্থান হয়।

সূরা বরাআত বা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লিখিত না হওয়ার এ তত্ত্বটি হাদীসের কিতাব আবূ দাউদ, নাসায়ী ও মসনদে ইমাম আহমদে স্বয়ং হযরত উসমান গনী (রা) থেকে এবং তিরমিযী শরীফে মুফাসসিরে কোরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত উসমান গনী (রা)-কে প্রশ্নও করেছিলেন যে, যে নিয়মে কোরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস করা হয় অর্থাৎ প্রথম দিকে শতাধিক আয়াতসম্বলিত বৃহৎ সূরাগুলো রাখা হয়—পরিভাষায় যাদের বলা হয় 'মি-ঈন', অতপর রাখা হয় শতের কম আয়াত সম্বলিত সূরাগুলো—যাদের বলা হয় 'মাসানী'। এর পর স্থান দেয়া হয় ছোট সূরাগুলোকে——যাদের বলা হয় 'মুফাচ্ছালাত'। কোরআন সংকলনের এ নিয়মানুসারে সূরা তওবাকে সূরা আন্‌ফালের আগে স্থান দেওয়া কি উচিত ছিল না? কারণ, সূরা তওবার আয়াতসংখ্যা শতের অধিক। আর আন্‌ফালের শতের কম। প্রথম দিকের দীর্ঘ সাতটি সূরাকে আয়াতের সংখ্যানুসারে যে নিয়মে রাখা হয়েছে যাদের سبع طوال বলা হয়; তদনুসারে আন্‌ফালের স্থলে সূরা তওবা থাকাই তো অধিক সঙ্গত। অথচ এখানে এ নিয়মের বরখেলাফ করা হয়। এর রহস্য কি?

হযরত উসমান গনী (রা) বলেন, কথাগুলো সত্য, কি কোরআনের বেলায় যা করা হল, তা সাবধানতার খাতিরে। কারণ, বাস্তবে সূরা তওবা যদি স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে আনফালের অংশ হয়, আর একথা প্রকাশ্য যে, আনফালের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় তওবার আয়াতগুলোর আগে, তাই ওহীর ইঙ্গিত ব্যতীত আন্‌ফালের আগে সূরা তওবাকে স্থান দেওয়া আমাদের পক্ষে বৈধ হবে না। আর একথাও সত্য যে, ওহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন হিদায়ত আসেনি। তাই আনফালকে আগে এবং তওবাকে পরে রাখা হয়েছে।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে সূরা আন্‌ফালের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাটি এর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ, এ সম্ভাবনা থাকার ফলে এখানে বিসমিল্লাহ্ লেখা বৈধ নয়, যেমন বৈধ নয় কোন সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ্ লেখা। এ কারণেই আমাদের মান্য ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণ বলেন, যে ব্যক্তি সূরা আন্‌ফালের তেলাওয়াত সমাপ্ত করে সূরা তওবা শুরু করে, সে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমেই সূরা তওবা থেকে তেলাওয়াত শুরু করে, কিংবা এর মাঝখান থেকে আরম্ভ করে, সে বিসমিল্লাহ্ পড়বে। অনেকে মনে করে যে, সূরা তওবার তেলাওয়াতকালে কোন অবস্থায়ই বিসমিল্লাহ্ পাঠ জায়েয নয়। তাদের এ ধারণা ভুল। অধিকন্তু, এ ভুলও তারা করে বসে যে, এখানে বিসমিল্লাহ্-র স্থলে তারা اعوذ بالله من النار পাঠ করে। এর কোন প্রমাণ হুযুর (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম থেকে পাওয়া যায় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক হযরত আলী (রা) থেকে অপর একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ দর্শানো হয় যে, বিসমিল্লাহ্‌তে আছে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম, কিন্তু সূরা তওবায় কাফিরদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তিগুলো নাকচ করে দেয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটিও এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব যা মূল কারণের পরিপন্থী নয়। মূল কারণ হল, তওবা ও আন্‌ফাল একটি মাত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনা। হ্যাঁ, উপরোক্ত কারণও যুক্ত হতে পারে যে, এ সূরায় কাফিরদের নিরাপত্তাকে নাকচ করে দেয়া হয় বিধায় 'বিসমিল্লাহ্' সঙ্গত নয়। তাই কুদরতের পক্ষ থেকে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব করে দেয়া হয় যাতে বিসমিল্লাহ্ লিখিত হয়।

সূরা তওবার উপরোক্ত আয়াতগুলোর যথাযথ মর্মোপলব্ধির জন্য যে ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, প্রথমে তা জেনে নেয়া আবশ্যক। এখানে সংক্ষেপে ঘটনাগুলোর বিবরণ দেয়া হল।

(১) সূরা তওবার সর্বত্র কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং এ প্রসঙ্গে অনেক হুকুম-আহকাম ও মাসায়েলের বর্ণনা রয়েছে। যেমন, আরবের সকল গোত্রের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিল করণ, মক্কা বিজয়, হোনাইন ও তাবুক যুদ্ধ প্রভৃতি। এ সকল ঘটনার মধ্যে প্রথম হল অষ্টম হিজরী সালের মক্কা বিজয়। অতপর এ বছরেই সংঘটিত হয় হোনাইন যুদ্ধ। এরপর তাবুক যুদ্ধ বাধে নবম হিজরীর রজব

মাসে। তারপর এ সালের যিলহজ্জ মাসে আরবের সকল গোত্রের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করার ঘোষণা দেয়া হয়।

(২) চুক্তি বাতিলের যে কথাগুলো আয়াতে উল্লিখিত আছে, তার সারমর্ম হল, ষষ্ঠ হিজরী সালে রসূলুল্লাহ্ (সা) ওমরা পালনের নিয়ত করেন। কিন্তু মক্কার কোরাইশ বংশীয় লোকেরা হযরত (সা)-কে মক্কা প্রবেশে বাধা দেয়। পরে তাদের সাথে হোদায়বিয়ায় সন্ধি হয়। এই মেয়াদকাল ছিল তফসীরে 'রূহুল-মা'আনী'র বর্ণনা মতে দশ বছর। মক্কার কোরাইশদের সাথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বসবাস করত। হোদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়, তার একটি ধারা এও ছিল যে, কোরাইশ বংশীয় লোক ছাড়া অন্যান্য বংশের লোকেরা ইচ্ছা করলে কোরাইশদের মিত্র অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মিত্র হয়ে তাঁর সঙ্গী হতে পারে। এ ধারা মতে 'খোযাআ' গোত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এবং বনূবকর গোত্র কোরাইশদের মিত্রে পরিণত হয়। এ সন্ধির অপর উল্লেখযোগ্য ধারা হল, এ দশ বছরে না পরস্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ বাধবে, আর না কেউ যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এদের কারো প্রতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্যদান হবে চুক্তি ভঙ্গের নামান্তর।

এ সন্ধি স্থাপিত হয় ষষ্ঠ হিজরীতে। সপ্তম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা) গত বছরের ওমরা কাযা করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করেন এবং তিনদিন তথায় অবস্থান করে সন্ধি মুতাবিক মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কিছু পাওয়া যায়নি।

এরপর পাঁচ-ছয় মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনূবকর গোত্র বনূ খোযাআর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কোরাইশরা মনে করে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থান বহু দূরে, তদুপরি এহল নৈশ অভিযান। ফলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে সহজে পৌঁছবে না। তাই তারা এ আক্রমণে লোক ও অস্ত্র দিয়ে বনূবকরের সাহায্য করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে, যা কোরাইশরাও স্বীকার করে নিয়েছিল, হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে ছিল দশ বছর কাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি।

ওদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মিত্র বনূ খোযাআ গোত্র ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়। তিনি কোরাইশদের চুক্তিভঙ্গের সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

বদর, ওহোদ ও আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের গায়েবী সাহায্য লাভের বিষয়টি কোরাইশরা আঁচ করে হীনবল হয়ে পড়েছিল। তার ওপর চুক্তিভঙ্গের বর্তমান ঘটনায় মুসলমানদের যুদ্ধপ্রস্তুতির আশংকা বেড়ে গেল। চুক্তিভঙ্গের সংবাদ হযরতের কাছে পৌঁছার পর পূর্ণ নীরবতা লক্ষ্য করে এ আশংকা আরো ঘণিভত হল। তাই তারা বাধ্য হয়ে আবূ সুফিয়ানকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মদীনায় প্রেরণ করে। যাতে তিনি মুসলমানদের যুদ্ধপ্রস্তুতি আঁচ করতে পারলে পূর্ববর্তী ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সেই চুক্তিকে নবায়ন করতে পারেন।